হিযবুত তাহ্‌রীর

(حزب التحرير)

খিলাফত প্রকাশনী

খায়রুন্নেসা ম্যানসন (৪র্থ তলা),
২৩৪ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

www.khilafat.org Website:
info@khilafat.orge-mail:

১৪২৫ হিজরী / ২০০৪ ইং

পবিত্র কুরআনের অনুবাদ

KiAvb ïagvÎ Zvi wbR¯ gj Avievx fvlv‡ZB h_vh_ fve I A_ cKvk K‡i| ZvB GUv †evSv c‡qvRb †h KiAv‡bi h_vh_ fvlvši Am¤e| evsjv fvlvfvlxiv hv‡Z KiAv‡bi e³e¨ m¤ú‡K avivYv jvf Ki‡Z cv‡ib ZvB G †`‡ki m¤§wbZ Awjg M‡Yi A‡b‡KB KiAv‡bi fvevbev` K‡i‡Qb| Avgiv GB eB‡q evsjv‡`‡k cPwjZ fvevbev` MŠ¸‡jvi mvnvh¨ MnY K‡iwQ|

প্রথম সংস্করণে কোনও ভুল-ত্রুটি কারো দৃষ্টিগোচর হলে দয়া করে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নিতে চেষ্টা করব।

কুরআনের আয়াতের অর্থের অনুবাদের ক্ষেত্রে অক্ষরগুলোকে *BUwjK* এবং সেইসাথে **বোল্ড** করে দেয়া আছে। হাদীসের অর্থের অনুবাদের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র **বোল্ড** করা হয়েছে।

এই বইটি হিযবুত তাহ্‌রীর কর্তৃক আরবী ভাষায় লিখিত حزب التحرير
বইটির ভাবানুবাদ

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
১. হিযবুত তাহ্‌রীর	**৫**
২. হিযবুত তাহ্‌রীর প্রতিষ্ঠার কারণ	**৬**
২.১ রাজনৈতিক দল গঠন করা শরঈ দায়িত্ব	৬
৩. হিযবুত তাহ্‌রীরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	**১৬**
৪. হিযবুত তাহ্‌রীরের সদস্যপদ	**১৭**
৫. হিযবুত তাহ্‌রীরের কার্যক্রম	**১৮**
৬. হিযবুত তাহ্‌রীরের কর্মক্ষেত্র	**২০**
৭. হিযবুত তাহ্‌রীরের অবলম্বনকৃত বিষয় সমূহ	**২১**
৮. হিযবুত তাহ্‌রীরের কর্ম পদ্ধতি	**২৩**
৯. হিযবুত তাহ্‌রীরের চিন্তা	**৩০**
৯.১ ইসলামী আকীদা	৩০
৯.২ শর'ঈ নীতিমালা	৩৩
৯.৩ শরঈ পরিভাষা সমূহ	৩৬
৯.৪ কিছু বাস্তব বিষয়ের সংজ্ঞা	৩৬
৯.৪.১ চিন্তা	৩৭
৯.৪.২ সমাজ	৩৮
৯.৫ বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান মতাদর্শ সমূহ	৩৯
৯.৫.১ গনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ	৩৯
৯.৫.২ সমাজতন্ত্র	৪২
৯.৬ বস্তুগত উন্নতি ও সভ্যতা	৪৩
৯.৭ ইসলামে শাসন ব্যবস্থার বিধানাবলী	৪৪
৯.৮ ইসলামী সরকার ব্যবস্থা	৪৪
৯.৮.১ খলীফা নিয়োগ করার পদ্ধতি	৪৫
৯.৮.২ খিলাফত শুধু একটি হওয়া	৪৮
৯.৯ ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি সমূহ	৪৯

৯.৯.১ সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর, কখনই মানুষের নয় ৪৯
৯.৯.২ হুকুমতের কর্তৃত্ব উম্মাহ্'র অধিকারে ৫০
৯.৯.৩ খলীফা একজন হওয়া আবশ্যক ৫১
৯.৯.৪ রাষ্ট্রে শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন করার অধিকার একমাত্র খলীফার ৫১
৯.১০ ইসলামী সরকারের কাঠামো ৫২
৯.১১ রাজনৈতিক দল ৫৩
৯.১২ শাসকদের জবাবদিহিতা ৫৪
৯.১৩ যে শাসক ইসলাম অনুযায়ী শাসন করে তার আনুগত্য করা ফরয ৫৪
৯.১৪ কোন শাসকের বিরুদ্ধে ততক্ষন পর্যন্ত বিদ্রোহ করা হারাম, যতক্ষন না সে সুস্পষ্ট কুফর দ্বারা শাসন শুরু করে ৫৫
৯.১৫ ইসলামে অর্থনৈতিক নীতিমালা ৫৭
৯.১৫.১ ইসলামী অর্থনীতি ৫৭
৯.১৫.২ ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক মূল সমস্যা ৫৭
৯.১৫.৩ মালিকানার উৎস ৫৭
৯.১৫.৪ মালিকানার প্রকার ৫৮
৯.১৫.৫ ভূমি সমূহ ৬৩
৯.১৫.৬ শিল্প কারখানা ৬৪
৯.১৫.৭ বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) ৬৪
৯.১৫.৮ নগদ অর্থের ব্যাপারে স্বর্ন- রৌপ্যকে মূল ভিত্তি বানানোর বাধ্যবাধকতা ৬৫
৯.১৬ শিক্ষা নীতি ৬৬
৯.১৭ রাজনীতি ও বৈদেশিক নীতি বিষয়ক চিন্তা ৬৬
৯.১৮ দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর ৬৭
৯.১৯ জিহাদ ৬৮
৯.২০ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ৬৮

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

১

হিযবুত তাহ্‌রীর

(حزب التحرير)

হিযবুত তাহ্‌রীর একটি ইসলামী মতাদর্শ (**Ideology**- مَبْـــدَأ) ভিত্তিক রাজনৈতিক দল। রাজনীতি এর কাজ, ইসলাম তার মূলনীতি। হিযবুত তাহ্‌রীর উম্মাহ্‌'র মাঝে উম্মাহ্‌কে সঙ্গে নিয়ে এ জন্য কাজ করে যাতে উম্মাহ্‌ ইসলামকেই তার একমাত্র ইস্যু হিসাবে ভাবতে শুরু করে এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানাবলীকে কার্যকর ও বাস্তবায়ন করার জন্য পুনরায় খিলাফত (ইসলামী শাসন ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা করতে উদ্বুদ্ধ ও সচেষ্ট হয়।

হিযবুত তাহ্‌রীর এমন কোন দল নয়, যা শুধু আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দেয়, কিংবা শুধুই দীনি তা'লীম বা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মগ্ন থাকে অথবা এটা কোন প্রশিক্ষন একাডেমী বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানও নয়, বরং এটি এমন এক রাজনৈতিক আন্দোলন; পূর্ণাঙ্গ ইসলামের চিন্তাই যার দেহের একমাত্র আত্মা। ইসলামই তার মূল কথা এবং ইসলামী চেতনাই তার জীবন রহস্য।

২
হিযবুত তাহ্‌রীর প্রতিষ্ঠার কারণ
(اسباب قيام حزب التحرير)

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনে বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যানের প্রতি আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং এরাই সফলকাম"
[আলি ইমরান, ১০৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার উপরোক্ত নির্দেশটি বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে। যেন এর কাজের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্‌কে চরম অধঃপতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা যায় এবং কুফরী চিন্তা, কুফরী ব্যবস্থা, কুফরী বিধি-বিধান আর কুফর রাষ্ট্র সমূহের প্রভাব ও আধিপত্য থেকে মুক্ত (তাহ্‌রীর) করা সম্ভব হয়। ইসলামী রাষ্ট্র তথা খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধি-বিধানের শাসন পুনরায় ফিরিয়ে আনাও এদল প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম কারণ।

২.১ রাজনৈতিক দল গঠন করা শরঈ দায়িত্ব
(وجوب قيام أحزاب سياسة شرعا)

ক.

ولتكن منكم امــة –বলে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা পালনার্থেই হিযবুত তাহ্‌রীর নামক দলটি গঠন করা হয়েছে। কারণ উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাদের মাঝে অবশ্যই এমন একটি সুগঠিত দল থাকে, যে দল নিম্মোক্ত দুটি কাজ সম্পাদন করবে।

১. খায়র তথা ইসলামের প্রতি আহ্বান করা।

২. আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ) করা।

বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে এ আয়াতে শুধু মাত্র একটি সুগঠিত দল গঠনের সাধারন নির্দেশই বিদ্যমান আছে। কিন্তু এখানে এমন আলামতও **(قرينة)** আছে, যা প্রমাণ করে যে নির্দেশটি অকাট্য এবং অবশ্য পালনীয় (ফরয)। এ আয়াত মুসলমানদের জন্য যে কাজ নির্ধারন করে দিয়েছে, তা হচ্ছে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা আর সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করা। এ কাজ যে মুসলমানদের জন্য ফরয এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় আরো অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَتَأمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشَكَنَّ اللهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِه ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ

"ঐ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অতি সত্বর আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আ'নিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ) কর। অন্যথায় অচিরেই তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আরোপিত হবে। অতঃপর তোমরা তাকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবেনা।"

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রতিভাত হয়ে গেছে যে, এখানের নির্দেশটি অকাট্য এবং এক্ষেত্রে (উপরের আয়াতে) নির্দেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ফরযিয়্যাত তথা অবশ্য পালনীয় অর্থ বুঝানোর জন্য।

খ.

এই দলটি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক দল যে, আলোচ্য আয়াতটি মুসলমানদের নিকট এমন একটি দল গঠন করার দাবী করেছে, যে দলের কাজ হবে ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা এবং আমর বিল মা'রূফ আর নাহি আনিল মুনকার করা। একাজের মধ্যে শাসকদেরকে ভাল কাজ করতে বলা এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখাও শামীল। শুধু তাই নয়, শাসকদেরকে কাজ কর্মের ব্যাপারে ভাল-মন্দের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা এবং তাদেরকে উপদেশ দেয়াই সবচেয়ে বড় আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আনিল মুনকার। আর এটি নামমাত্র রাজনৈতিক কাজ নয়, বরং এটিই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কাজ। বস্তুতঃ একাজটি হচ্ছে কোন রাজনৈতিক দলের মূল কাজ সমুহের একটি। সুতরাং এ আয়াত প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক ধাঁচের দল গঠন করা ফরয। তবে এ আয়াত এই সীমাবদ্ধতাও আরোপ করেছে যে, এই দলটি হতে হবে

ইসলামী দল। কারণ এর কাজ হবে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা আর আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আনিল মুনকার করা। এমন কাজ শুধু কোন ইসলামী দলই করতে পারে।

ইসলামী দল বলা হয় এমন দলকে যা প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী আকীদার উপর ভিত্তি করে এবং যার একমাত্র অবলম্বন হয় ইসলামী চিন্তা ও ইসলামী নিয়ম-নীতি; আর যা কোন বিষয়ে সমাধানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইসলামী সমাধানকেই অবলম্বন করে। সাথে সাথে এর কর্মপদ্ধতিও হয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী। সুতরাং মুসলমানদের মাঝে এমন কোন দল থাকা বৈধ নয়, যা চিন্তা কিংবা পদ্ধতিগতভাবে অনৈসলামিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলারই নির্দেশ। কারণ সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য ইসলামই একমাত্র বিশুদ্ধ আদর্শ। তাছাড়া ইসলাম হচ্ছে এমন এক বিশ্বজনীন মতাদর্শ যা মানব প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ইসলামই মানুষকে সত্যিকার মানুষের মর্যাদা দিয়ে তার সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। ইসলাম শুধু মাত্র মানুষের জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তিগুলো পূরণের উপায়ই বলে দেয়না, বরং এগুলোকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করে যাতে এগুলো হয় পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ। অর্থাৎ ইসলাম মানুষকে দেহ ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ন স্বাধীন অবস্থায়ও ছেড়ে দেয়না, আবার পরোপুরি দমিয়েও রাখেনা। অন্যদিকে এক প্রবৃত্তিজাত চাহিদাকে অপর প্রবৃত্তিজাত চাহিদার উপর চাপিয়েও দেয়না। এটি এমন এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, যা মানব জীবনের সকল বিষয়কে সুসংগঠিত করে দেয়।

গ.

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে চলা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। চাই তা সৃষ্টিকর্তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার হউক, যেমন আকীদা ও ইবাদত বিষয়ক বিধি-বিধান কিংবা তা মানুষের নিজস্ব বিষয় হউক- যেমন ব্যক্তি চরিত্রের ব্যাপার, পানাহার, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধি-বিধান; অথবা অন্যান্য বিষয় যেমন পারস্পরিক লেন-দেন, জীবিকা নির্বাহ, আইন-কানুন ইত্যাদি বিষয়ক নিয়মাদি। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের জন্য এটাও ফরয করেছেন যে, তারা যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম বাস্তবায়ন করে এবং সে অনুযায়ী বিচার- ফয়সালা করে আর তাদের আইন-কানুন ও সংবিধানের ভিত্তি হয় কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে সংগৃহীত শরঈ নিয়ম-নীতি।

ইরশাদ হয়েছে,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ

"আর আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করুন তা দিয়ে যা আল্লাহ্ অবতীর্ন করেছেন এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।"
[মায়িদা, ৪৮]

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"আর আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করুন তা দিয়ে যা আল্লাহ্ অবতীর্ন করেছেন। আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন; যেন তারা আপনার নিকট আল্লাহ্র প্রেরিত কোন বিধান থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে।" [মায়িদা, ৪৯]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ন করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয়না তারাই কাফের।" [মায়িদা, ৪৪]

ইসলাম ব্যাতীত অন্য যে সকল মতাদর্শ রয়েছে, যেমন পুঁজিবাদ, কমিউনিজম তথা সমাজতন্ত্র এগুলো সব দুর্নীতিগ্রস্থ এবং মানব স্বভাব পরিপন্থী। আর এগুলো সবই মানবরচিত। এগুলোর দুর্নীতি এবং ত্রুটি সমূহ প্রকাশ পেয়ে গেছে। তাছাড়া এগুলো ইসলাম এবং ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং এগুলো অবলম্বন করা, এগুলোর ধারক-বাহক হওয়া কিংবা এগুলোর প্রতি আহবান করা এবং এগুলোর বুনিয়াদের উপর কোন সংগঠন তৈরী করা সবই হারাম। অতএব, মুসলমানদের দল কায়েম হবে শুধু মাত্র ইসলামী আকীদা, ইসলামী ফিকির এবং ইসলামী তরীকার উপর ভিত্তি করে। তাই পুঁজিবাদ, কমিউনিজম তথা সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে কোন দল গঠন করা মুসলমানদের জন্য হারাম। এমনি ভাবে এসব দলের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করা এবং এগুলোর প্রচলন ঘটানোও হারাম। কারণ এগুলো কুফর ভিত্তিক দল। যা মানুষকে কুফরের দিকে ডাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) গ্রহন করতে চাইলে,তা কখনও কবুল করা হবেনা এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" [আলি ইমরান- ৮৫]

এবং পূর্বে বর্ণিত আয়াতে আছে– يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْـرِ অর্থাৎ তারা (মুসলমানরা) ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"কোন ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত"

তিনি আরো বলেন,

مَنْ دَعَا اِلَى عَصَبِيَّةٍ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি আসাবিয়্যার (জাতীয়তাবাদের) প্রতি আহ্বান করে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়"

ঘ.

মুসলিম উম্মাহ্ বর্তমানে যে পশ্চাদপদতা ও লাঞ্ছনার গহ্বরে পতিত তা থেকে উম্মাহ্কে উদ্ধার করা এবং উম্মাহকে কুফরী চিন্তা, কুফরী ব্যবস্থা, কুফরী বিধি-বিধান, কুফর দেশসমূহের আধিপত্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত করা কেবল মাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন উম্মাহ্র চিন্তার বর্তমান অধঃপতনকে পরিবর্তন করে উন্নত চিন্তার বিকাশ ঘটানো যাবে। আর এটা করার উপায় হচ্ছে যে চিন্তাগুলো মুসলিম উম্মাহ্কে অপদস্থতার এই চরম অবস্থা পর্যন্ত এনে পৌঁছিয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে ইসলামী চিন্তা দ্বারা সেগুলোর পরিবর্তন ঘটানো।

বস্তুতঃ উম্মাহ্র বর্তমান অবস্থার কারণ হচ্ছে ইসলামকে বুঝে তার বিধি–বিধানকে মান্য করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অবহেলা এবং দুর্বলতা, যা অনেক আগে থেকে শুরু হয়ে আজও চলছে। এই চিন্তাগত অধঃপতনের দরুন উম্মাহ্'র মাঝে বহু নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে, যার প্রধান প্রধান কিছু বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. হিন্দু, পারসিক এবং গ্রীক দর্শনের অনুপ্রবেশের পর ইসলাম আর এসব দর্শনের মাঝে পূর্ণ বৈপরিত্য থাকা সত্বেও কেউ কেউ ইসলামকে এগুলোর সাথে মিলানোর চেষ্টা করেছেন।

২. ইসলামের দুশমনরা ইসলামের দুর্নাম করা এবং মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার জন্য ইসলামের নামে মুসলমানদের মাঝে এমন কিছু বিধি-বিধান ও চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, যা আদৌ ইসলামী নয়।

৩. ইসলামের উপলব্ধি এবং এর বিধি-বিধানগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে আরবী ভাষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের ক্রমবর্ধমান ধারাবাহিকতার এক পর্যায়ে হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে একে ইসলাম থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে; যদিও আল্লাহ্‌র দ্বীনকে তার মূল ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য কোন ভাষা দিয়ে পুরোপুরি উপলব্ধি করা অসম্ভব। তাছাড়া নতুন নতুন পরিস্থিতিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে মাসআলা ইস্তিম্বাত করা এবং সে আলোকে ফাতওয়া প্রদানের জন্য আরবী ভাষার নাহু-সরফ, আদাব, বালাগাত-ফাসাহাত (ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলংকার) ইত্যাদি বিষয়ের সুগভীর জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।

৪. খৃষ্টীয় সতের শতাব্দী হতে পশ্চিমা কুফর দেশগুলো মুসলমানদের উপর মিশনারী, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আগ্রাসন চালাতে শুরু করে। তাদের এই আগ্রাসনের উদ্দেশ্য ছিল উম্মাহ্‌র মধ্যে ইসলামের বুঝ এর ব্যাপারে বিকৃতি ঘটিয়ে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে ইসলামকে ধ্বংস করা।

ঙ.

এহেন পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ইসলামী-অনৈসলামী বহু আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সবই অকৃতকার্য রয়ে গেছে। না মুসলমানদেরকে জাগ্রত করা সম্ভব হয়েছে, না অধঃপতন ও যিল্লতির পথ রোধ করা গেছে। ইসলাম দ্বারা মুসলমানদেরকে জাগ্রত করার এসব চেষ্টা ও আন্দোলন সফল না হওয়ার পিছনে অনেক কারন রয়েছে, যেমন-

(১) অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয়েছে যে, যাঁরা মুসলমানদেরকে জাগ্রত করার সুকঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তারা নিজেরাই ইসলামিক চিন্তাকে যথাযথ গভীরতায় অনুধাবন করেননি। এটা এ জন্য হয়েছে যে, তাঁরা প্রায়শই কিছু আচ্ছন্নকারী বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁরা মুসলিম উম্মাহ্‌কে জাগ্রত করার মাধ্যম হিসাবে সুনির্দিষ্ট কোন চিন্তা ও পদ্ধতির কথা বলেননি; বরং মোটা দাগে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। মুসলমানদের বাস্তব সমস্যাবলীর ইসলামিক সমাধান এবং ঐ সমাধানগুলোর প্রায়োগিক দিক নিয়ে তারা সুগভীর আলোচনা করেননি। এসব সমাধানগুলো তাঁদের নিজেদের চিন্তার মাঝেও স্বচ্ছভাবে ছিলনা। ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পারিপার্শিক অনৈসলামিক বাস্তবতাই তাদের চিন্তার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। শুধু তাই নয়, বাস্তবতার সাথে ইসলামকে মিলানোর জন্য কেউ কেউ ইসলামের এমনসব ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, যা নুসূস তথা কুরআন ও হাদীস দ্বারা অনুমোদিত নয় এবং যা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে

কিরাম থেকে বর্ণিত হয়ে আসা মূল ব্যাখ্যার পরিপন্থী। মোট কথা অনৈসলামিক বাস্তবতাকে ইসলাম দ্বারা পরিবর্তন করার বিষয়টিকে মুখ্য হিসাবে দেখার পরিবর্তে প্রচলিত বাস্তবতার সাথে ইসলামকে মিলিয়ে ও মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্যই ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির সাথে ইসলামের পরিপূর্ণ বৈপরিত্য থাকা সত্বেও তাঁদের কেউ কেউ এগুলোকে ইসলামী বলে গণ্য করেছেন এবং মানুষকে এগুলোর প্রতি আহ্বান করেছেন।

(২) ইসলামী চিন্তা ও আহকাম বাস্তবায়নের সঠিক ও সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করার পরিবর্তে আপাতঃ ফলদায়ক কিছু করাকেই তাদের কেউ কেউ ইসলাম বাস্তবায়নের পথ মনে করেছেন। আর ইসলামী পুণঃর্জাগরণের উপায় হিসাবে শুধুমাত্র মসজিদ নির্মাণ, বই পত্র প্রকাশ, দাতব্য ও সমাজ-সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান খোলা, চরিত্র গঠন ও ব্যক্তির সংশোধনকেই মনে করেছেন যথেষ্ট। অন্য দিকে সমাজ নষ্ট হওয়া কিংবা সমাজের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী কুফর চিন্তা, কুফর ব্যবস্থা ও কুফর বিধি-বিধানের প্রাবল্য সম্পর্কে তারা ছিলেন অনেকটাই অমনোযোগী। তাদের ধারনা ছিল ব্যক্তির সংশোধন দ্বারাই সমাজ সংশোধন হয়ে যাবে। অথচ সমাজ সংশোধন করার কার্যকর উপায় হচ্ছে ব্যক্তির সংশোধনের পাশাপাশি সমাজের চিন্তাধারা, অনুভূতি এবং ব্যবস্থাদিরও সংশোধন করা । আর ব্যক্তির সংশোধনও অনেকাংশে সমাজ সংশোধন দ্বারাই সম্ভব। কারন সমাজ শুধুমাত্র কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টিরই নাম নয়, বরং সমাজ হচ্ছে ব্যক্তি ও কতিপয় সম্পর্কের সমষ্টির নাম। অর্থাৎ সমাজ বলা হয়, ব্যক্তি, চিন্তা, অনুভূতি এবং শাসন ব্যবস্থার সমষ্টিকে। তাই সমাজ পরিবর্তন করতে হলে এ সবগুলোকেই পরিবর্তন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জাহেলী সমাজকে ইসলামী সমাজে পরিবর্তন করার জন্য এ কাজগুলোই করেছেন। তিনি সমাজে বিদ্যমান আকীদা (বিশ্বাস) কে পরিবর্তন করে ইসলামী আকীদায় পরিনত করেছেন। জাহেলী চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা এবং প্রথাগুলোকে তিনি ইসলামী চিন্তা-ভাবনা, ইসলামী ধ্যান-ধারণা এবং ইসলামী আচরণ দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) মানুষের আবেগ-অনুভূতিগুলোকে জাহেলী চিন্তা, জাহেলী বিশ্বাস এবং জাহেলী প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামী আকীদা এবং ইসলামী চিন্তা ও আহকামের সাথে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এ পথেই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর রাসূলকে মদীনার সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। যখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মদীনাবাসী ইসলামী আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরা ইসলামী চিন্তা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামী আহকামকে আপন করে নিয়েছেন, তখনই তিনি (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ "বাই'আতে'আকাবায়ে ছানিয়ার" (আকাবার দ্বিতীয় বাই'আত) পর মদীনায় হিজরত করেছেন এবং সেখানে ইসলামী বিধি-বিধান সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকর করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। এভাবেই মদীনায় একটি ইসলামী সমাজ কায়েম হয়েছিল।

(৩) কেউ কেউ মনে করেছেন মুসলিম জনগনের উপর শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামের পুর্ণজাগরণ সম্ভব। তাই তারা অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। কিন্তু তারা "দারুল কুফর" এবং

"দারুল ইসলামের" মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হননি। তারা এটাও উপলব্ধি করেননি যে, দারুল কুফর এবং দারুল ইসলামে দাওয়াত এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে কী ধরনের ভিন্নতা থাকা উচিত? আজকে আমরা যে সব দেশে বসবাস করছি, এগুলোও নীতিগতভাবে দারুল কুফর। কারন এখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও কাফেরদের চিন্তা, বিধি-বিধান ও কুফরী শাসন ব্যবস্থাই কার্যকর। এ অবস্থাটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়্যত প্রাপ্তির সময়ের মক্কা শরীফের অবস্থার সাথে অনেকাংশেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব, এখানের দাওয়াতের ধরনও হবে সেসময়ের মতই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর মক্কী জীবনের সুন্নাহ্ অনুযায়ী ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীগুলো শুধু দাওয়াত ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, কোনরূপ সশস্ত্র তৎপরতার রূপ লাভ করবেনা। কারণ তখনকার কাজের উদ্দেশ্য এটা ছিলনা যে, শুধুমাত্র এমন কোন শাসককে হটানো যে ইসলামী রাষ্ট্রে কুফর আইন চালু করেছে কিংবা সে নিজে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে (যাকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অপসারণ করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে) বরং উদ্দেশ্য ছিল একটি দারুল কুফরকে তার সমস্ত চিন্তা ও ব্যবস্থাদিসহ পুরোপুরি পরিবর্তন করা। আর এই পরিবর্তন সম্ভব সে দেশের বা সে সমাজের ব্যাপক জনগণের মধ্যে বিদ্যমান চিন্তা, অনুভূতি এবং প্রচলিত রাষ্ট্রকাঠামোকে পুরোপুরি পরিবর্তনের মাধ্যমে। রাসূল (সাঃ) মক্কায় সে উদ্দেশ্যেই কাজ করেছিলেন।

অপরদিকে দারুল ইসলামের বিষয়টি ভিন্ন। দারুল ইসলাম হচ্ছে এমন ভূমি যেখানে আল্লাহ্‌র অবতীর্ন আহ্‌কাম দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু কোন শাসক যদি ক্ষমতায় এসে সরাসরি স্পষ্ট কুফরী বিধান দ্বারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে শুরু করে, তাহলে তার বিরোধিতা করা মুসলমানদের জন্য ফরয। মুসলমানরা তাকে চ্যালেঞ্জ করবে, যেন সে পুনরায় ইসলামের দিকে ফিরে আসে। যদি সে ফিরে না আসে, তাহলে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা উম্মাহ্'র উপর ফরয হয়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে তাকে পুনরায় আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান চালু করার জন্য বাধ্য করা হবে। যেমন হযরত উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ)-বর্ণিত এক হাদীসে আছে,

وَاَنْ لاَّ نُنَا زِعَ الاَمْرَ اَهْلَهُ الاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ

"এবং (আমরা রাসূল (সাঃ) এর সাথে এ বাই'আতও করেছি যে) আমরা 'উলূল আমরের' সাথে ততক্ষন পর্যন্ত বিবাদ করবনা, যতক্ষন না সে প্রকাশ্য কুফুরীতে লিপ্ত হয়; (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) এমন কুফুরী যে বিষয়ে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত কোন শক্তিশালী প্রমান রয়েছে।"

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আ'উফ ইবনে মালিক (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন,

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ

“বলা হলো হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি তরবারী দ্বারা তাদেরকে অপসারণ করবোনা? তিনি বল্‌লেন ‘না! যতক্ষন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে সালাত কায়েম রাখবে।”

সালাত কয়েম রাখার কথা বলে এখানে ইসলামী আহ্‌কাম মোতাবেক শাসন পরিচালনার প্রতি ইংগিত (كناية) করা হয়েছে (দ্বীনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রুকন উল্লেখ করে সম্পূর্ণ দ্বীনকে বুঝানোর মূলনীতি অনুযায়ী)। এই দু’টি হাদীস আমাদেরকে দারুল ইসলামে শাসকদেরকে চ্যালেঞ্জ করা এবং তাদেরকে স্পষ্ট কুফরী থেকে বিরত রাখার জন্য কিভাবে কখন অস্ত্র ধরা বা শক্তি প্রয়োগ করা যাবে, তার পন্থা শিখিয়ে দিয়েছে।

চ.

খিলাফত তথা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তাআলার নাযিল করা আহকাম মোতাবেক পরিচালিত শাসন পদ্ধতিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা একারনে জরুরী যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানদেরকে শরীয়তের সকল আহ্‌কামের উপর দৃঢ়ভাবে আমল করা এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ পালন করা ফরয। আর এসব কিছু একটি ইসলামী রাষ্ট্র এবং একজন খলীফা ব্যতীত সম্ভব নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে খিলাফতের পতনের পর থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণ ইসলামী কর্তৃপক্ষ এবং আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন ব্যবস্থা ব্যতীত জীবন যাপন করছে। তাই পুনরায় ইসলামী খিলাফত তথা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আহ্‌কামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য কাজ করা মুসলমানদের উপর ফরয। এ কাজকে এড়িয়ে যাওয়া বা এতে কোন প্রকার অবহেলা করার অবকাশ নেই। এ কাজে অবহেলা বা গড়িমসি করা অনেক বড় গুনাহ। যার জন্য আল্লাহ্‌ তা‘আলা কঠিন শাস্তি দিবেন।

রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

“যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল যে, তার কাঁধে (কোন খলীফার) বাই‘আত নেই, সে যেন জাহেলী মরণ মরল।”

একাজের ব্যাপারে অবহেলা করার অর্থ হচ্ছে ইসলামের একটি ফরযের ব্যাপারে অবহেলা করা। কারন ইসলামী আহ্‌কাম সমূহ বাস্তবায়ন করা খিলাফতের উপর নির্ভরশীল। আর মূলনীতি হলো,

مَالَايَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلاَّ بِه فَهُوَ وَاجِبٌ

যা ছাড়া কোন ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, তাও ওয়াজিব

অতএব, এ উদ্দেশ্য হাসীলের জন্যই হিযবুত তাহ্‌রীর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার বুনিয়াদ হচ্ছে ইসলামী আকিদা। এদল তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলামের ঐ সব চিন্তা ও নিয়ম-নীতিকেই অবলম্বন হিসাবে গ্রহন করেছে, যা এ কাজের জন্য অপরিহার্য। হিযবুত তাহ্‌রীর দল হিসাবে ঐ সব দুর্বলতার পথরোধ করতে সক্ষম হয়েছে, যেগুলোর দরুন ইসলামী জাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত অনেক দলই সফল হতে পারেনি। এ দল এমন সব চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অতি সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুধাবন করেছে, যা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল আকারে অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে এবং যার প্রতি সাহাবাগণের ইজমা ও কিয়াসের দিক নির্দেশনা রয়েছে ।

দলটি বাস্তব পরিস্থিতি নিয়েও গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করেছে, যেন এ পরিস্থিতিকে ইসলাম দ্বারা পরিবর্তন করা যায়। হিযবুত তাহ্‌রীর দাওয়াতের পদ্ধতি হিসাবে ঐ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে, যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কী জীবনে অবলম্বন করেছিলেন এবং যার দ্বারা মদীনায় বাস্তবায়িত হয়েছে একটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ব্যক্তির মাঝে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে সংযোগ সেতু বা রাবেতা অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল ইসলামী আহ্‌কাম ও ফিকির। তাই হিযবুত তাহ্‌রীরও কেবল ইসলামী আকিদা ও রীতি-নীতিকেই দলের সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের একমাত্র বিষয় হিসাবে গ্রহন করেছে। সুতরাং হিযবুত তাহ্‌রীর এমন একটি উপযুক্ত দল, যাকে উম্মাহ্ গ্রহন করতে পারে এবং তার সহযাত্রী হতে পারে। বস্তুতঃ উম্মাহ্‌র জন্য কর্তব্য হচ্ছে এমন একটি দলকেই বেছে নেয়া এবং তার সঙ্গী হওয়া। কারণ এটি এমন দল, যে আপন চিন্তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে নিজ পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে এবং স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সেই সাথে এ দল কোন অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রদর্শিত পথ পরিহার না করার নীতিতে অটল ও অবিচল থাকার সংকল্প গ্রহন করেছে।

৩
হিযবুত তাহ্‌রীরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
(غايةحزب التحرير)

হিযবুত তাহ্‌রীরের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুনরায় ইসলামী জীবন পদ্ধতিকে ফিরিয়ে আনা এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলামের আহ্বান পৌঁছিয়ে দেয়া। অন্য ভাবে বলতে গেলে এ দলের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্‌কে দারুল ইসলামে, ইসলামিক জীবন ধারায় ফিরিয়ে আনা, যে সমাজে জীবনের প্রতিটি বিষয় পরিচালিত হবে শরঈ বিধান মোতাবেক এবং প্রতিটি বিষয় বিবেচিত হবে হালাল হারামের দৃষ্টিতে। বস্তুতঃ এ উদ্দেশ্য তখনই বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব, যখন রাষ্ট্রে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকে। খিলাফত ব্যবস্থায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে এমন একজন খলীফা নিযুক্ত করা হয়, যার হাতে মুসলমানগণ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) মোতাবেক শাসন করা, দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের আহ্বানকে তুলে ধরার শর্ত সাপেক্ষে বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহন করে।

এটাও হিযবুত তাহ্‌রীরের একটি উদ্দেশ্য যে, আলোকিত চিন্তা ধারার সাহায্যে উম্মাহ্‌র মধ্যে সঠিক জাগরণ সৃষ্টি করা, যেন উম্মাহ তার হারানো শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব আবার ফিরে পেতে পারে এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অতীতের ন্যায় আবারো বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে। উম্মাহ্‌ তার সেই অবস্থান ফিরে পেলে এই পৃথিবী পুনরায় ইসলামী শাসনের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহন করতে পারবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর এই উদ্দেশ্যেও কাজ করে, যাতে সমগ্র মানব জাতি হিদায়াতের আলো পেতে পারে এবং এই উম্মাহ্‌ কুফর চিন্তা চেতনা ও পদ্ধতি সমূহের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত হয় আর শেষ পর্যন্ত ইসলাম সারা বিশ্বের উপর বিজয় লাভ করে।

৪
হিযবুত তাহ্‌রীরের সদস্যপদ
(العضوية فى حزب التحرير)

আরব, অনারব, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ যেকোন মুসলিম নারী বা পুরুষ হিযবুত তাহ্‌রীরের সদস্য হতে পারে। কারন এটি সমস্ত মুসলমানদের দল। এ দল জাতি, বর্ণ, বংশ, মাযহাব নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে ইসলামের পতাকা বহন করা এবং ইসলামী ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রতি আহবান করে এবং সকলকে ইসলামিক দৃষ্টিতে দেখে।

এ দলের সাথে কোন ব্যক্তির জড়িত হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে ইসলামী আকীদা এখতিয়ার করা, দলের চিন্তা ও মতামতকে গ্রহন করা এবং এগুলোর ব্যাপারে দৃঢ়তা অর্জন করা। কেউ এ দলে শামীল হয়েছে বলে তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন সে নিজেকে এর সাথে একাত্ম বোধ করে দাওয়াতের কাজ করতে থাকবে এবং এই দাওয়াত সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব বিষয় হয়ে যাবে। মোট কথা হিযবুত তাহ্‌রীরের সদস্যদের মাঝে গড়ে উঠা সম্পর্কের ভিত হচ্ছে ইসলামী আকীদা ও দলের ঐ চিন্তা, যা ইসলামী আকীদা থেকে উৎসারিত হয়। এ দলে মহিলাদের হালাকাগুলো (পাঠচক্র) পুরুষদের থেকে পৃথক হয় এবং মহিলাদের হালাকার মুশরিফ বা তদারককারী হন কোন মহিলা কিংবা তাদের কোন মাহ্‌রাম ব্যক্তি বা স্বামী।

৫
হিযবুত তাহ্‌রীরের কার্যক্রম
(عمل حزب التحرير)

হিযবুত তাহ্‌রীরের কাজ হচ্ছে ইসলামের আহ্বান তুলে ধরার মাধ্যমে বর্তমান নষ্ট সমাজকে সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন করে ইসলামী সমাজে পরিণত করার জন্য অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এ কাজের প্রক্রিয়া হলো **প্রথমতঃ** বর্তমানে বিরাজমান চিন্তাগুলোকে ইসলাম দ্বারা পরিবর্তন করতে করতে ইসলামের পক্ষে এমন ব্যাপক জনমত তৈরি করা, যা মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করবে ইসলাম বাস্তবায়ন এবং তার চাহিদা মোতাবেক কাজ করতে। **দ্বিতীয়তঃ** সমাজের অনুভূতিগুলোকে এমন ভাবে পরিবর্তন করা, যেন জণগণের পছন্দ অপছন্দের মাপ কাঠি হয় আল্লাহ্‌র খুশী-অখুশী এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন সমস্ত কাজ তারা প্রত্যাখ্যান করে। **তৃতীয়তঃ** জনগণের মধ্যে বিরাজমান অনৈসলামিক প্রথা ও লেন-দেনের সম্পর্কগুলোকে পরিবর্তন করে একনিষ্ঠ ইসলামী সম্পর্ক সৃষ্টি করা, যেগুলো সর্বাবস্থায় ইসলামী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। হিযবুত তাহ্‌রীরের এ কাজ গুলো হলো সিয়াসি বা রাজনৈতিক কাজ। কেননা হিযবুত তাহ্‌রীর জণগনের বিষয়াদীতে ইসলামী শরী'আহ আইনের বাস্তবায়ন এবং ইসলামী সমাধান প্রয়োগের ইস্যু নিয়ে কাজ করে। আর সিয়াসতও মূলতঃ ইসলামী বিধি-বিধান মোতাবেক মানুষের বিষয়াদির দেখা-শোনা ও তত্ত্বাবধানেরই নাম। এই তত্বাবধান ক্ষেত্র বিশেষে ইসলামী মতামত প্রদান কিংবা ইসলামী বিধি-বিধান প্রয়োগ উভয় প্রকারেই হতে পারে।

বস্তুত এসব রাজনৈতিক কর্ম-কান্ড দ্বারাই উম্মাহকে ইসলামী সভ্যতায় অলংকৃত করা এবং নষ্ট বিশ্বাস, ভ্রান্ত চিন্তা, কুফরী মতবাদ ও মতামতের প্রভাব থেকে মুক্ত (তাহ্‌রীর) করা সম্ভব।

রাজনৈতিক তৎপরতার দু'টি দিক। একটি হচ্ছে রাজনৈতিক সংগ্রাম অন্যটি হচ্ছে চিন্তার লড়াই। চিন্তার লড়াইয়ের বিষয়টি কুফরী চিন্তা এবং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত। এই লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হলো, যেন এর মাধ্যমে কুফরী ব্যবস্থা, ভ্রান্ত চিন্তা, বাতিল আকীদা ও ধ্যান-ধারনার অসততা আর ত্রুটিগুলোকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায়। সাথে সাথে এসব বিষয়ে শর'ঈ মত ও বিধান কি, তাও বর্ণনা করা যায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালানো হয় সাম্রাজ্যবাদী কাফিরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। যেন এর মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলো থেকে তাদের চিন্তাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ভিতগুলোর মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয়। অনুরূপভাবে ক্ষমতাসীন যালিম শাসকদের খেয়ানতগুলো সুস্পষ্ট করা, ষড়যন্ত্রগুলো ফাঁস করা, তাদেরকে জবাবদিহিতার মুখোমুখী করা, উম্মাহ্‌র অধিকার হরণের সময়ে তাদেরকে বাধা দেয়া, আপন দায়িত্ব

পালনে গাফলতির ক্ষেত্রে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা, উম্মাহ্‌র স্বার্থের প্রতি অমনোযোগীতা কিংবা কোন ইসলামী হুকুমের বিরোধিতার ব্যাপারে সরকারকে নিষেধ করা বা বিরত রাখাও রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্তর্ভূক্ত।

হিযবুত তাহ্‌রীর সব সময়ই রাজনীতির গুরু দায়িত্ব পালন করে আসছে। ক্ষমতায় থাকা না থাকা নির্বিশেষে সর্বাবস্থায় তাকে এ দায়িত্ব পালন করতেই হবে। এই দলের কোন কাজ বিশেষ কোন প্রশিক্ষণমূলকও নয় আবার এটা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নয়। শুধু কেবল উপদেশ দেয়াও এর কাজ নয়। মৌলিকভাবে রাজনীতিই এর কাজ। এদল ইসলামী ফিকির এবং আহকামকে এজন্য উপস্থাপন করে, যেন জীবনের কার্যক্ষেত্রে তথা রাষ্ট্রীয়ভাবে এর উপর আমল করা যায়।

হিযবুত তাহ্‌রীর এমনভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়, যেন তা বাস্তবায়ন হয় এবং ইসলামী আকীদাই হয় রাষ্ট্র, সংবিধান ও সকল আইন-কানুনের ভিত্তি। ইসলামের আকীদা বুদ্ধিবৃত্তিক (عقلـــى) ভাবে উপলব্ধিযোগ্য একটি আকীদা। এটা এমন আকীদা, যা থেকে ব্যাপক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে, যে ব্যবস্থা মানুষের আমল-আখলাক ছাড়াও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রের সমস্যা সমূহের সমাধান দিয়ে থাকে।

৬
হিযবুত তাহ্‌রীরের কর্মক্ষেত্র
(مكان عمل حزب التحرير)

ইসলাম যদিও একটি বিশ্বজনীন আদর্শ তথাপি এর কর্মপদ্ধতি এমন নয় যে, প্রারম্ভেই বিশ্বের সর্বত্র এর কর্মকান্ডকে ব্যাপৃত করা হবে। এর আহ্বান হবে বিশ্বজনীন, তবে প্রাথমিকভাবে এর কর্মতৎপরতা পরিচালিত হবে এক বা একাধিক বিশেষ দেশকে কেন্দ্র করে। যেন সেই বিশেষ দেশটি ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে পরিনত হতে পারে এবং সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

এমনিতে তো সমগ্র পৃথিবীই ইসলামের দাওয়াতের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র সমুহের নাগরিকগণ যেহেতু ইসলামকে নিজেদের দীন মনে করে, একারনে ইসলাম কায়েমের আহ্বান তাদের মাঝেই শুরু করা উচিৎ। আরব দেশ সমূহের জনগণ মুসলিম উম্মাহ্'র একটি বিরাট অংশ। তারা আরবীতে কথা বলে এবং তা বুঝে। আরবী কুরআন ও হাদীসের ভাষা এবং ইসলামের আলংকারিক অংশ। শুধু তাই নয়, এ ভাষা ইসলামী সভ্যতার উপাদান সমূহের একটি বুনিয়াদি বিষয়। এ কারনে দাওয়াতের সূচনা আরব দেশে হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

হিযবুত তাহ্‌রীরের জন্ম এবং দাওয়াতের সূচনাও আরব বিশ্বেই হয়েছিল। এর পর থেকে স্বাভাবিকভাবেই তা নিজের দাওয়াতকে ব্যাপক করার জন্য বিস্তার লাভ করে চলছে। চলতে চলতে বর্তমানে এ দল আরবের প্রায় সবদেশ অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে অনারবী মুসলিম দেশ সমূহেও তার কর্মপরিধি সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে।

৭

হিযবুত তাহ্‌রীরের অবলম্বনকৃত বিষয় সমূহ

(التبنى فى حزب التحرير)

উম্মাহ্‌র বর্তমান অবস্থা, মহানবী (সাঃ) এর যুগ, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ, তাবেঈনের যুগ, তাবে তাবেঈনের যুগ, রাসূল (সাঃ) এর জীবনে দাওয়াত দানের সূচনালগ্ন থেকে মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়কালসহ প্রত্যেকটি যুগের উপর গভীর ভাবে অধ্যয়ণ ও গবেষণা ছাড়াও রাসূল (সাঃ) এর মদনী জীবন, কুরআন, হাদীস, সাহাবীগণের ইজমা এবং কিয়াসের ভিত্তিকে অনুসরন করে, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও মুজতাহিদ ঈমামগণের আলোকিত চিন্তাকে ধারণ করার মাধ্যমে এবং এসকল মূলনীতি সমূহের ভিত্তিতে হিযবুত তাহ্‌রীর তার কর্ম পদ্ধতি সংক্রান্ত চিন্তা, মতামত ও নিয়ম-নীতি গ্রহন করেছে। এই চিন্তা, মতামত ও নিয়ম-নীতিগুলো একান্তই ইসলামী। এর কোন একটি নিয়মও অনৈসলামিক নয় বা অনৈসলামিক বিষয়াবলী দ্বারা প্রভাবিত নয়।

হিযবুত তাহ্‌রীর কখনো কোন অনৈসলামীক নীতি বা দলীলের উপর নির্ভর করেনা বরং এটি শুধু মাত্র ইসলামী চিন্তার উপরই নির্ভর করে। হিযবুত তাহ্‌রীর শুধুমাত্র ঐসকল চিন্তা, নিয়ম নীতি এবং মতামতকেই তার কর্ম পদ্ধতি হিসাবে এখতিয়ার করেছে, যা খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও খলীফা নিয়োগের মাধ্যমে ইসলামী জীবনধারাকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াতকে ব্যাপক করার জন্য আবশ্যক ছিল। হিযবুত তাহ্‌রীর তার চিন্তা, মতামত ও নিয়মনীতি বিভিন্ন বই ও প্রচারপত্রে লিপিবদ্ধ করে জনগণের সামনে প্রকাশ করেছে। দলের প্রকাশিত বইগুলো হচ্ছে-

১- ইসলামী জীবন বিধান
২- ইসলামী শাসন ব্যবস্থা
৩- ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
৪- ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা
৫- দল গঠনের প্রক্রিয়া
৬- হিযবুত তাহ্‌রীরের চিন্তাসমূহ
৭- ইসলামী রাষ্ট্র
৮- ইসলামী ব্যক্তিত্ব (তিন খন্ডে)
৯- হিযবুত তাহ্‌রীরের রাজনৈতিক ধারনাসমূহ
১০- হিযবুত তাহ্‌রীরের রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গি
১১- সংবিধানের ভূমিকা
১২- খিলাফত

১৩- কিভাবে খিলাফতকে ধ্বংস করা হলো
১৪- ইসলামী দন্ড বিধি
১৫- ইসলামে সাক্ষ্যের বিধি-বিধান
১৬- মার্কসীয় কমিউনিজমের জবাব
১৭- চিন্তা
১৮- মনের অবস্থান
১৯- ইসলামী চিন্তা
২০- পশ্চিমা পুঁজিবাদী তত্ব-'থিওরী অব লায়াবিলিটি'র জবাব
২১- উষ্ণ আহ্বান
২২- আদর্শ অর্থনৈতিক নীতি
২৩- বাইতুল মাল
২৪- ইসলামী নাফসিয়্যা'র অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ

এমনি ভাবে হিযবুত তাহ্‌রীর হাজার হাজার লিফলেট, নিবন্ধ, স্মারক এবং বহু রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। হিযবুত তাহ্‌রীর এসমস্ত চিন্তা ও বিধানাবলীকে রাজনৈতিকভাবে মানুষের নিকট নিকট পেশ করে, যেন মানুষ তা অবলম্বন করে, এ অনুযায়ী আমল করে এবং তাকে রাষ্ট্র ও জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করে। কেননা ইসলাম যাতে বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হয় এমন ভাবে এর দাওয়াত নিয়ে কাজ করা মুসলমান হিসাবে এবং দল হিসাবে আমাদের সবার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিযবুত তাহ্‌রীর ইসলামী চিন্তা ও বিধি–বিধান অবলম্বনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কুরআন, হাদীস, ইজমায়ে সাহাবা এবং কিয়াসের উপর নির্ভর করে। কেননা এগুলোই হচ্ছে ঐ চারটি মূল উৎস, যেগুলোর বিশুদ্ধতা কাত্‌ঈ (অকাট্য) দলীল দ্বারা সাব্যস্ত এবং এগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের কারো কোন এখতেলাফ (মতভেদ) নেই।

৮
হিযবুত তাহ্‌রীরের কর্ম পদ্ধতি
(طريقة حزب التحرير)

ইসলামের দাওয়াতকে প্রসারিত করার জন্য হিযবুত তাহ্‌রীর যে কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা প্রকৃত পক্ষে শরীআ'তের ঐসব বিধি-বিধানই, যা দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর পবিত্র সীরাত থেকে সংগৃহীত। আর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অনুকরণ করা আমাদের উপর ফরয। কারন আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَو
الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের আশা করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমানে স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"
[আল-আহ্‌যাব, ২১]

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"বলুন! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।" [আলি'ইমরান, ৩১]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যে ব্যাপারে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।" [আল-হাশ্‌র, ৭]

এছাড়াও এমন আরো বহু আয়াত রয়েছে, যেগুলো একথার দলীল বহন করে যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অনুগত্য করা এবং তাঁর আনীত দ্বীন গ্রহন করাই মুসলিমদের জন্য

ফরয। বর্তমানে মুসলমানরা যেহেতু এমন রাষ্ট্রসমূহে বসবাস করছে যে রাষ্ট্রগুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার নাযিলকৃত বিধি-বিধানকে বাদ দিয়ে কুফরী বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে, সেহেতু শরীআতের দৃষ্টিতে এ রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নবুয়্যত প্রাপ্তির সময়ের মক্কার মতই। তাই এ সব দেশে দাওয়াতী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সীরাতের ঐ সময়টিকেই পথ চলার মশাল হিসাবে নিরূপন করতে হবে।

মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করার পর থেকে মদীনায় ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সীরাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাব যে, সে সময়টিতে তিনি কিছু বিশেষ এবং স্পষ্ট পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলেছিলেন। আর কিছু বিশেষ এবং স্পষ্ট কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। এ কারনে হিযবুত তাহ্রীরও তার কর্মপদ্ধতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) এর অনুকরণে ঐ সব কর্মগুলোকেই বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী গ্রহন করেছে এবং এরই ভিত্তিতে স্বীয় মিশনকে তিনটি স্তর বা পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছে।

১ম পর্যায়ঃ-

দল গঠনের পর্যায়ঃ এ দলের চিন্তা ও পদ্ধতিতে আস্থাশীল ব্যক্তিদেরকে গঠন মূলক প্রক্রিয়ায় এমন ভাবে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, যেন এর মাধ্যমে একটি সুশৃংখল দল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

২য় পর্যায়ঃ-

গণ আন্দোলন সৃষ্টির পর্যায়ঃ যেন এর মাধ্যমে উম্মাহ্ ইসলামের পতাকাধারী রূপে তৈরী হয় এবং একাজকে নিজেদের উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব বলে মনে করে। আর নিজেদের বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধি-বিধান কার্যকর করার তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

৩য় পর্যায়ঃ-

শাসন কর্তৃত্ব লাভের মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করা এবং বিশ্বব্যাপী এর দাওয়াত পৌঁছানোর পর্যায়।

হিযবুত তাহ্রীরের ১ম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে আল কুদ্স অঞ্চলে ১৩৭২ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৩ সনে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন বিজ্ঞ আলিম, বিখ্যাত গবেষক, অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং এক সময়ের আল কুদস-এর উচ্চতর শরী'আহ আদালতের বিচারপতি শায়খ তাকীউদ্দীন আন্ নাবাহানী (রহঃ)। এ পর্যায়ে হিযবুত তাহ্রীর প্রথমে উম্মাহ্'র সদস্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে শুরু করে এবং স্বীয় চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতি (فكرة ও طريقة) কে ব্যক্তি পর্যায়ে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে। জনগণ যখন এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তা গ্রহন করে নেয়, তখন তাদেরকে হিযব-এর হালাকায়ে দরস বা পাঠচক্রে শামীল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। হালাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের যে সব চিন্তা ও আহকামকে দল অবলম্বন করেছে, তা যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং

এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি একজন ইসলামী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় অর্থাৎ তার আকলিয়্যাহ (জ্ঞান-বুদ্ধি) ও নফসিয়্যাহ (মন-মানসিকতা) হয় ইসলামী; আর সে ইসলামের দাওয়াত বহন করার ব্যাপারে হয় বদ্ধপরিকর। যখন কোন ব্যক্তি এ পর্যায়ে উপনীত হয় এবং নিজেকে দলের কাজের সাথে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম বোধ করে, তখনই সে প্রকৃত পক্ষে দলের একজন সদস্য হয়ে যায়। মূলতঃ এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ। তাঁর (সাঃ) ক্ষেত্রে এ পর্যায়টি তিন বছর এভাবে চালু ছিল। তিনি মানুষের সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করতেন। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান আনতেন, তাদেরকে তিনি গোপনে তাঁর জামাআতে শামীল করে নিতেন এবং দীনি তা'লীমের মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর সেসময়ের অন্যতম প্রধান কাজ। তাদের সামনে তিনি নাযিলকৃত কুরআনের আয়াত সমূহ পাঠ করতেন, যেন তাদের অন্তরে ইসলাম দৃঢ়ভাবে বসে যায়। তিনি তাদের সাথে গোপনে মিলিত হতেন এবং ইসলামের তা'লীম দিতেন। তাঁরাও (সাহাবীগণ) চুপে চুপে নিজেদের ইবাদত পালন করতেন। এরপর ধীরে ধীরে মক্কায় ব্যাপক হারে মানুষের মুখে ইসলামের বিষয়টি আলোচিত হতে থাকে। লোকজনও দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অনুসরণে দাওয়াতের প্রথম পর্যায়ে হিযবুত তাহ্রীরও দলীয় কাঠামো গড়ে তোলা, দলের পরিধি বৃদ্ধি করা আর মারকায (কেন্দ্র) সমূহে হালাকয়ে দরসের মাধ্যমে ব্যক্তি গঠনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। এভাবে দলটি ইসলামী জীবন ধারার মাপ কাঠিতে গড়ে ওঠা একদল মুসলমানের সমন্বয়ে এমন একটি সুসংগঠিত জামাআত প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে, যারা এ দলের চিন্তা-চেতনা ধারণ করা এবং অন্যদের নিকট এই চিন্তা সমূহ পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নিবেদিত প্রাণ দাঈ বা আহ্বায়ক রূপে কাজ করছে। হিযবুত তাহ্রীর যখন একটি সুসংগঠিত দলে পরিণত হয় এবং সমাজ এ দলটিকে চিনতে ও বুঝতে শুরু করে, তখন দল তার কর্ম পদ্ধতির দ্বিতীয় ধাপে পা রাখে।

এধাপ হচ্ছে উম্মাহ্র মধ্যে জাগরণ ও **গণ আন্দোলন সৃষ্টির পর্যায়।** আর এটা এজন্য করা হয়, যেন উম্মাহ্র মাঝে যথাযথ সচেতনতা ও জনমত সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত উম্মাহ্ নিজেই ইসলামের পতাকা বহন করার জন্য এগিয়ে আসে। এ পর্যায়ে দলের উদ্দেশ্য থাকে উম্মাহ্ যেন দলের (তথা ইসলামী) চিন্তা-চেতনার সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যায় আর খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাস্তব জীবনে ইসলামকে কার্যকর করা ও ইসলামের বাণী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তীব্র তাড়না অনুভব করে।

আলোচ্য পর্যায়ে দাওয়াতের কাজ শুধু ব্যক্তিস্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেনা বরং সমাজ ও সামগ্রিক জনগোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করেও তা পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে দল যেসব কর্মসূচী গ্রহন করেছে, তা হল-

১–স্বীয় অস্তিত্বের প্রসার, সদস্য–সংখ্যা বৃদ্ধি, দাওয়াতের ভার বহন করার জন্য উপযুক্ত মানুষ তৈরী এবং চিন্তাগত সংগ্রাম ও রাজনৈতিক ময়দানে তৎপরতা চালানোর মত ব্যক্তি গঠনের উদ্দেশ্যে হালাকায়ে দরসের মাধ্যমে সদস্যদেরকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার প্রতি প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া।

২–জনসাধারনের সামনে বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে গণমানুষকে দলের অবলম্বনকৃত ইসলামী চিন্তা ও বিধানের আলোকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে (ক) সভা, সমাবেশ, সেমিনার, বিতর্ক ইত্যাদি আয়োজন করা, (খ) মসজিদে দরস দেয়া (গ) মানুষ জড়ো হওয়ার প্রধান প্রধান স্থান গুলোতে বক্তৃতা/বয়ানের ব্যবস্থা করা (ঘ) লিফলেট, পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশ্যে বিতরণ করা যেন এ সবের মাধ্যমে উম্মাহ্‌র মাঝে সম্মিলিত জাগরণ সৃষ্টি হয় এবং তারা এ দলের চিন্তার সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে আগ্রহ অনুভব করে।

৩–কুফুরী আকাইদ, কুফুরী ব্যবস্থা, নষ্ট চিন্তা, ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং বাতিল দৃষ্টিভঙ্গির সাথে চিন্তাগতভাবে দল এমন এক লড়াইয়ে অবতীর্ন হয়েছে, যার দ্বারা এ সবের বক্রতা, ভ্রান্তি, অসততা ও ইসলাম বিরোধিতা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে। আর একাজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে উম্মাহকে এগুলোর কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করা।

৪– রাজনৈতিক সংগ্রামঃ এ সংগ্রাম পরিচালনার উপায় হচ্ছে- (ক) মুসলিম দেশগুলোর উপর আধিপত্যবাদী ও প্রভাব বিস্তারকারী কুফর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সমূহের যে কোন চেহারা- যেমন চিন্তাগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক ইত্যাদি সর্ব প্রকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবিরত লড়াই করা। সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রের মুখোশ উম্মোচন করে উম্মাহ্‌কে তাদের কবল থেকে মুক্ত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখা। (খ)–আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সরকার গুলোর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষন করা। যখন তারা উম্মাহ্‌'র অধিকার হরণ করে কিংবা নিজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে অথবা কোন জরুরী বিষয়কে উপেক্ষা করে বা ইসলামের কোন হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করে, তখন বলিষ্ঠভাবে তার প্রতিবাদ করা এবং তাদের কুফর শাসনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে তরান্বিত করা।

৫–শরঈ বিধি-বিধান মোতাবেক জনগণের স্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখা এবং তাদের বিষয়াদির দেখা-শোনা করা।

হিযবুত তাহ্‌রীর উপরোক্ত সব কাজ করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরন করার মাধ্যমে। যেমন পবিত্র কুরআনের আয়াত-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (الحجر: ৯৪).

(*অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেকে উপেক্ষা কর*) নাযিল হওয়ার পর তিনি (সাঃ) ইসলামের দাওয়াতকে জন সম্মুখে প্রকাশ করে

দিয়েছেন। তিনি কুরাইশ বংশের লোকদেরকে সাফা পর্বতের পাদদেশে সমবেত করে বললেন, 'আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী'। তিনি তাদের কাছে জানতে চাইলেন যে, তারা কি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে? এভাবে তিনি–তাঁর দাওয়াতকে বিভিন্ন লোক সমাগমে তেমনি ভাবে তুলে ধরতে লাগলেন, যেমনিভাবে তুলে ধরতেন ব্যক্তিপর্যায়ের দাওয়াতী কার্যক্রমে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কুরাইশদের দেব-দেবী (উপাস্য), আকিদা ও চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ করলেন। তিনি তাদের গোমরাহী এবং ভ্রান্তিগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি সমকালীন সকল বিশ্বাস ও চিন্তার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামকে নিয়োজিত করলেন। এ সময় তারা যে সব মন্দ ও গর্হিত কাজে লিপ্ত ছিল সেগুলোর বিরুদ্ধে একের পর এক আয়াত নাযিল হতে লাগল। যেমন সুদের কারবার, কন্যা শিশুকে জীবন্ত করবস্থ করা, মাপে কম দেয়া এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে নাযিলকৃত আয়াত সমূহ। এছাড়াও কুরাইশ সরদার এবং তাদের পিতৃপুরুষদের নির্বোধ আচরণ, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগনের বিরুদ্ধে কাফিরদের গোপন ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিষয়েও তখন অনেক আয়াত নাযিল হয়েছিল।

হিযবুত তাহ্‌রীর স্বীয় চিন্তার ক্ষেত্রে সৎ, স্বচ্ছ ও খোলামেলা। তাই এই দল ভুল মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য ব্যক্তি ও দলের চিন্তাকে প্রশ্ন করা, কাফির সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং জনগণের উপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের মোকবেলার জন্য প্রকাশ্যে শাসক গোষ্টিকে চ্যালেঞ্জ করা ইত্যাদি কাজে কোন রূপ নমনীয়তা, অবহেলা কিংবা আপোষকামিতার নীতি অনুসরণ করেনা। এ ব্যাপারে হিযবুত তাহ্‌রীর কারো মুখরক্ষার নীতি অবলম্বন করে না কিংবা বিরূপ প্রতিক্রিয়া-পরিনতির আশংকা করে সত্য প্রকাশ থেকেও বিরত হয়না। মোট কথা এদল এমন প্রত্যেক বিষয়কেই চ্যালেঞ্জ করে, যা ইসলামী নিয়ম-নীতির খেলাফ। একারনেই বিভিন্ন দেশের সরকার দীর্ঘ দিন ধরে হিযবুত তাহ্‌রীরের সদস্যদেরকে গ্রেফতার, শারীরিক নির্যাতন, চলাফেরায় কড়াকড়ি আরোপ, দেশ থেকে বহিস্কার, মালামাল ক্রোক, জীবনের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা, ভ্রমনে বাধাদান এমনকি হত্যা করার মতো কঠিন নিপীড়ন ও শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে। ইরাক, সিরিয়া এবং লিবিয়াসহ বহু মুসলিম দেশের জালিম শাসকরা হিযবুত তাহ্‌রীরের শত শত সদস্যকে হত্যা করেছে। এমনিভাবে জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, লিবিয়া, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং তিওনিসিয়াসহ অনেক দেশের জেলগুলোতে হিযবুত তাহ্‌রীরের হাজার হাজার সদস্য বন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

হিযবুত তাহ্‌রীর উপরোক্ত প্রতিটি কাজই রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর অনুকরণ ও আনুগত্যের ভিত্তিতে সম্পাদন করে। তিনি (সাঃ) সত্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে সমগ্র পৃথিবীর সামনে ইসলামের দাওয়াতকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। প্রথাগত নিয়ম, চলমান রেওয়াজ, অপরাপর মতাদর্শ ও ধর্মবিশ্বাস, রাজা-প্রজার অবস্থান ইত্যাদি কোন কিছুর তোয়াক্কা না করেই তিনি (সাঃ) প্রতিটি কুফর ও যুলমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি একমাত্র ইসলামের দাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই

পরোয়া করেননি। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) সর্বাগ্রে কুরাইশদের সামনে তাদের দেব-দেবীগুলোর দোষত্রুটিসমূহ পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি প্রমানসহ বলতেন যে, তারা বদ্ধমূল নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত। এসবকিছু তিনি (সাঃ) একাই শুরু করেছেন। তাঁর নিকট তখন না ছিল যুদ্ধাস্ত্র, না ছিল আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী। একমাত্র ইসলামের দাওয়াতের উপর অবিচল আস্থা ব্যাতীত তাঁর আর অন্য কোন হাতিয়ারই ছিলনা।

হিযবুত তাহ্‌রীর যদিও তার দাওয়াতকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরার জন্য চ্যালেঞ্জের পথই বেছে নিয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে তার কর্মসূচীগুলোকে শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্ম-কান্ডের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। শাসকগোষ্ঠী কিংবা দাওয়াতী কাজে বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার পেশী শক্তি প্রয়োগ কিংবা অস্ত্র ব্যবহার কোনটাই এ দল এখন পর্যন্ত অবলম্বন করেনি। এই নীতিটিও গ্রহণ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর অনুকরণে। কারণ তিনি হিজরতের পূর্বে মক্কী জীবনে শুধুমাত্র দাওয়াত, প্রতিবাদ ও গণসচেতনতার কাজই করেছেন, কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগের পথে যাননি। বাইআ'তে আকাবায়ে সানীয়ায় (আকাবার দ্বিতীয় বা'ইআত) অংশগ্রহনকারী সাহাবীগণ ঘুমন্ত মিনাবাসীদেরকে তরবারী দিয়ে শেষ করে ফেলার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন-'আমরা এখনও এর অনুমতি পাইনি'। তখন আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলকে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের মত যুলুমের মুখে ধৈর্য ধারনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا

"এবং আপনার পূর্বেও অবশ্যই অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাদের নিকট আমার সাহায্য না আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল।" [আনআম, ৩৪]

হিযবুত তাহ্‌রীরের কর্মপদ্ধতিতে নিজের আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তি ব্যবহার না করার ব্যাপারটি ইসলামের জিহাদ বিষয়ের সাথে কোন ভাবেই সম্পর্কযুক্ত নয়। কারন জিহাদ তো কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। যখনই কাফির শত্রুরা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের উপর আক্রমন করে তখন তাদের মোকাবেলা করা সে দেশের বাসিন্দাদের উপর ফরয হয়ে যায়। এমন আক্রান্ত দেশে বসবাসকারী হিযবুত তাহ্‌রীরের সদস্যরাও সে দেশের মুসলমানদেরই অংশ। সুতরাং শত্রুর সাথে লড়াই করা এবং তাদেরকে স্বীয় দেশ থেকে বিতাড়িত করা অপরাপর বাসিন্দাদের মতো হিযবুত তাহ্‌রীরের সদস্যদের উপরও ফরয। এমন অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে যে, কোন মুসলমান আমীর আল্লাহ্‌র দীনকে সুউচ্চ করার জন্য জিহাদের পথ অবলম্বন করল এবং সাধারন

মানুষকে আহ্বান করল জিহাদের ময়দানে অবতীর্ন হতে, তখন ঐ দেশে অবস্থানকারী হিযবুত তাহ্‌রীরের সদস্যগণ অবশ্যই এ ডাকে সাড়া দিবে।

হিযবুত তাহ্‌রীরের সামনে যখন (কোন কোন দেশে) সমাজের এ অবস্থা উপস্থিত হয়েছে যে, লোকজন আগে যাদেরকে নেতা বলে মান্য করত এখন সেই নেতা ও তাদের নেতৃত্বের উপর থেকে আস্থা সরিয়ে এনেছে, শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে ষড়যন্ত্রের ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত মিশনগুলোকে সফল করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে এবং সরকার কর্তৃক জনসাধারনের উপর আরোপিত অত্যাচারের মাত্রা চরমে পৌঁছেছে, তখন এ দল নিম্নবর্নিত দুটি উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী লোকদের কাছে সহযোগিতা অন্বেষণ করতে শুরু করেছে।

প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত। যেন দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে খিলাফত কায়েম তথা ইসলাম বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া।

সহযোগিতা ও সমর্থন অনুসন্ধানের এই অবস্থানের পাশাপাশি হিযবুত তাহ্‌রীর তার পূর্বের কার্যক্রম তথা- হালাকার মাধ্যমে সদস্যদেরকে গঠন করা, সামষ্টিক শিক্ষা, গণসচেতনতা সৃষ্টি, ব্যাপক জনমত গঠনের প্রচেষ্টা, কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাদের ষড়যন্ত্রের বিষয়গুলো মানুষের সামনে তুলে ধরা, শাসকদেরকে সতর্ক করা এবং উম্মাহ্‌র স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর দেখা–শোনা ও তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি সব কাজ আগের মতই অব্যাহত রেখেছে। এদল উপরোক্ত প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রেই নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রেখে আল্লাহ্‌র কাছে এ আশা পোষণ-করে যে, তিনি যেন এ দলকে এবং মুসলিম উম্মাহকে সাহায্যদান ও সফল করেন। অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্যে একসময় মুমিনরা আনন্দিত হবে।

৯
হিযবুত তাহ্‌রীরের চিন্তা
(فكرة حزب التحرير)

হিযবুত তাহ্‌রীর যে চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, যে চিন্তা দিয়ে এদল নিজের প্রতিটি সদস্যকে তিলে তিলে গড়ে তোলে এবং যে চিন্তার আলোকে উম্মাহ্‌কে জাগ্রত করার অব্যাহত প্রয়াস চালায়, তা হচ্ছে ইসলামী চিন্তা অর্থাৎ ইসলামী আকীদা এবং সে আকীদা থেকে উৎসারিত চিন্তা ও বিধি-বিধান সমূহ। ইসলামী চিন্তা থেকে হিযবুত তাহ্‌রীর সেই সব বিষয়কেই নির্বাচন করেছে, ইসলামী সমাজ গড়ার আন্দোলনে লিপ্ত একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে যেগুলো অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল। এ দল তার অবলম্বনকৃত চিন্তা-চেতনাকে বিভিন্ন বইপুস্তক ও প্রকাশনার মাধ্যমে পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছে এবং প্রত্যেকটি বিধান, প্রত্যেকটি রায়, প্রত্যেকটি চিন্তা ও প্রত্যেকটি ধারনার জন্য বিস্তারিত দলীলাদি পেশ করেছে। এগুলোর মধ্যস্থিত গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে আলোচিত হলো।

৯.১ ইসলামী আকীদা (العقيدة الاسلامية)

ইসলামী আকীদা হলো আল্লাহ্‌, তাঁর কিতাব,তাঁর রাসূল, ফেরেশতা এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনয়ন করার সাথে সাথে এই বিশ্বাসও পোষণ করা যে, কাযা (قضاء) কদরের (قدر) ভাল-মন্দ সব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়। ঈমান হচ্ছে তাসদীকে (تصديق جازم) জাযিম তথা প্রত্যয়দৃপ্ত বিশ্বাসের নাম। যা দলীলের মাধ্যমে ইল্‌ম মোতাবেক হয়ে থাকে। তাসদীক ততক্ষন পর্যন্ত প্রত্যয়দৃপ্ত হয়না, যতক্ষন পর্যন্ত তা অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত না হয়। সুতরাং আকীদার দলীল অকাট্য হওয়া জরুরী। আকীদা বলা হয় এ কথার সাক্ষ্য দেওয়াকে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল। আর সাক্ষ্য ততক্ষন পর্যন্ত সাক্ষ্য হয়না, যতক্ষন পর্যন্ত তা ইলম্‌, একীন এবং তাসদীকযুক্ত না হয়। ظن (অনুমান নির্ভর ধারনা) এর উপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য হয়না। কারন ظن ইল্‌ম ও একীনের ফায়দা দেয়না।

ইসলামী আকীদাই মূলতঃ ইসলাম ও জীবন সম্পর্কে প্রত্যেকটি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি। ইসলামের এই আকীদা রাষ্ট্র, সংবিধান, সমস্ত আইন-কানুন এবং ঐ সমস্ত বিষয়েরও মূল ভিত্তি, যা এই আকীদা থেকে উৎসারিত হয়। এমনি ভাবে এই আকীদা ইসলামের সমস্ত চিন্তা, আহ্‌কাম এবং ধ্যান-ধারনারও বুনিয়াদ। যে সমস্ত চিন্তা, মতামত, আহকাম এবং ধ্যান-ধারনা এই আকীদা থেকে উদ্গত হয় বা এর বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্টিত হয়, সেগুলো

দুনিয়ার বিষয়াদী এবং তার তত্বাবধানের সাথে এমন ভাবেই সম্পর্ক রাখে, যেমন সম্পর্ক রাখে আখেরাতের বিষয়াদীর সাথে। বস্তুত: এই আকীদা দুনিয়ার সকল লেন দেন শুদ্ধ করার মূল ভিত্তি। এর মঝেই নিহীত আছে বেচা কেনা, কেরায়া (ভাড়া), ওকালত, কাফালাত (custody), মালিকানা, বিবাহ-শাদী, শিরকত (যৌথমালিকানা), ওয়ারাসাত (উত্তরাধিকার) ইত্যাদির যাবতীয় বিধি-বিধান। এর মাঝে পার্থিব লেন-দেনকে উত্তম রূপে সাজানোর সাথে সম্পৃক্ত নিয়ম-নীতিকে কার্যকর করার বিষয়াদিও বিবৃত আছে। যেমন আমীর নিযুক্ত করা, তার আনুগত্য করা, তাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখী করাসহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের বিধি-বিধান। এমনি ভাবে জিহাদ, সন্ধি, নিরাপত্তা, বিচার-আচার ইত্যাদির নিয়ম-নীতির বুনিয়াদও হচ্ছে উক্ত আকীদা। মোটকথা এটা মানুষের বাস্তব বিষয়াদি সমাধান করার আকীদা। এই আকীদা সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত বিধায় এটি রাজনৈতিক আকীদাও বটে। কারণ রাজনীতি (সিয়াসাত) হচ্ছে জীবনের বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও তত্বাবধানের নাম। এজন্যই এই আকীদা ইসলামের দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া, এর হিফাযত করা, একে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা,রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এর পৃষ্ঠপোষকতা করা, একে বাস্তবায়ন করা, অব্যাহত রাখা এবং সরকারের পক্ষ থেকে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবহেলা দেখা দিলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কর্ম-কান্ড থেকে পৃথক হতে পারেনা।

এই আকীদা দাবী করে একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাই সকল ইবাদতের উপযুক্ত এবং শুধু কেবল তার সামনেই প্রকাশ করা হবে সকল প্রকার বিনয় ও বশ্যতা। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টি তথা প্রতীমা, মূর্তি, কুপ্রবৃত্তি, মানবমনের খেয়াল-খুশী ইত্যাদি কোন কিছুই ইবাদত ও আনুগত্যের উপযুক্ত নয়। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, বিধান দাতা, ফয়সালাকারী, যখন যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতার অধিকারী, হিদায়াত দাতা, রিযিক দাতা, জীবন দাতা, মৃত্যু দাতা এবং সাহায্যকারী। তিনিই একমাত্র সত্ত্বা যার হাতে সকল রাজত্ব, ক্ষমতা এবং তিনিই যাবতীয় বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর সৃষ্ট মাখলূকাতের কেউ তাঁর কাজে শরীক নেই।

এই আকীদা আরো দাবী করে যে, একমাত্র মুহাম্মদ (সাঃ)ই আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ নবী এবং রাসূল। তিনি ছাড়া আর কেউ ব্যক্তি হিসাবে চরম আনুগত্যের অধিকারী নয়। অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আর কারো দ্বীনকে শরীয়ত হিসাবে মান্য করা যাবেনা। তিনিই তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মানুষ পর্যন্ত শরীয়ত পৌঁছানেওলা। সুতরাং তিনি এবং তাঁর দীনের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তি বা মতাদর্শকে অথবা অপর কোন আইন প্রনয়নকারী থেকে দ্বীন বা জীবন বিধান গ্রহন করা জায়েয নেই।
ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যে ব্যাপারে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।" [আল-হাশ্‌র, ৭]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা কোন মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অধিকার থাকে না।" [আল-আহযাব, ৩৬]

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর ন্যস্ত করে।" [নিসা, ৬৫]

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"সুতরাং যারা তাঁর (মুহাম্মদ) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" [নূর, ৬৩]

এই আকীদা এটাও দাবী করে যে, ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে একবারেই কার্যকর করা হবে। যেমনি ভাবে ইসলামের কিছু বিধানকে কার্যকর করে বাকীগুলোকে অকার্যকর অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হারাম, তেমনি ভাবে ক্রমান্বয়ে আজ কিছু কাল কিছু এভাবে বাস্তবায়ন করাও হারাম। কারণ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর মুসলমানদের জন্য পূর্ণ দ্বীন কার্যকর করা বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে।

ইরশাদ হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।" [আল মায়িদা, ৩]

ইসলামের বিধানাবলীর মাঝে কোন প্রকার পার্থক্যকরণ পদ্ধতি নেই। অর্থাৎ কার্যকর করার ক্ষেত্রে সব নির্দেশই সমান। যেমন সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) সহ সাহাবাগণ যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে জিহাদ করেছেন। অথচ যাকাত অস্বীকার করার দরুন তারা শুধু একটি মাত্র হুকুম অস্বীকার করেছিল। যারা ইসলামের বিধানাবলীর মধ্যে পার্থক্য করে এবং শুধুমাত্র কিছু হুকুম মান্য করে আল্লাহ্ তাআলা এমন লোকদেরকে দুনিয়ার দুর্দশা এবং আখেরাতে কঠোর আযাবের ভয় দেখিয়েছেন।
ইরশাদ হয়েছে,

أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামত দিবসে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।" [বাকারা, ৮৫]

হিযবুত তাহ্রীর মৌলিক চিন্তা তথা আকীদা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর উপর গভীর অধ্যয়ণ ও গবেষনা করেছে। যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলার বিদ্যমান থাকা, নবী ও রাসূলগণকে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা, কুরআনে কারীম আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ন কিতাব হওয়া এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র শেষ নবী হওয়া ইত্যাদি বিষয়কে পবিত্র কুরআন, হাদীস তথা নকলী ও আকলী দলীলাদি দিয়ে প্রমান করা হয়েছে। এমনি ভাবে এ দল কাযা-ক্বদর, রিযিক, মৃত্যু, তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ, হিদায়াত এবং পথভ্রষ্টতার মত বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করেছে।

৯.২ শর'ঈ নীতিমালা (القواعد الشرعية)

সমস্ত কাজকর্মের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো শরীয়তের বিধানকে অনুসরণ করা। কোন কাজের শরঈ বিধান জানার আগ পর্যন্ত সে কাজ না করা। এমনিভাবে বস্তু বিষয়ক মূলনীতি হচ্ছে এই যে, যেসব বস্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলীল বিদ্যমান আছে, সেগুলো ব্যতীত সকল বস্তুই হালাল।

প্রতিটি মুসলমান এ নীতির কাছে দায়বদ্ধ যে, সে তার সকল কর্মকান্ড শরীয়তের বিধান মোতাবেক সম্পাদন করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর ন্যস্ত করে।" [নিসা, ৬৫]

তিনি আরো ইরশাদ করেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যে ব্যাপারে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক" [হাশর, ৭]

মুসলমানের বুনিয়াদী বিষয় হচ্ছে যে, সে শরীয়তের হুকুম মেনে চলবে। হুকুম বলা হয় বান্দার কাজ কর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে شـــارع (শরীয়ত প্রবর্তক) তথা আল্লাহ্‌র খেতাব বা সম্বোধনকে। এ জগতের এমন কোন বস্তু বা কাজ নেই, যে সম্পর্কে شـــارع (শরীয়ত প্রবর্তক) এর বিধান নেই। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনে কারীমে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" [মায়িদা, ৩]

অন্য আয়াতে বলেছেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা" [নাহাল, ৮৯]

شارع অর্থাৎ শরীয়ত প্রবর্তকের সাধারন খেতাব হচ্ছে ইবাহাত মূলক। ইবাহাতও একটি শরঈ হুকুম। ইবাহাত বলা হয় شـــارع (শরীয়ত প্রবর্তক) এর পক্ষ থেকে মানুষকে কোন কাজ করা না করার এখতিয়ার দেওয়াকে।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" [বাকারা, ২৯]

তিনি আরো বলেন,

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

"তিনি আকাশ ও জমিনের সব কিছুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন।" [জাসিয়া, ১৩]

আসমান জমিনে যা কিছু বিদ্যমান আছে, যেগুলোকে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন-এর সব গুলোই আমাদের জন্য মুবাহ। এক্ষেত্রে বিশেষ দলিলের প্রয়োজন নেই। আ'ম (ব্যাপক) দলীলের আওতায়ই এগুলো এসে গেছে।

كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا

"পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্ত আছে তা থেকে তোমরা আহার কর।" [বাকারা, ১৬৮]

এ থেকে বুঝা যায় যে, সাধারণভাবে অর্থাৎ ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সব জিনিষ খাওয়া হালাল। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন দলীল প্রয়োজন নেই। এটা আম দলীলের আওতাভূক্ত, তবে কোন জিনিষ খাওয়া হারাম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এমন দলীল প্রয়োজন যা প্রমান করে যে এবস্তুটি হারাম এবং মুবাহ হওয়ার আ'ম দলীল থেকে তা ব্যতিক্রমী। যেমন মৃত জানোয়ার, খিঞ্জির (শুকর), পতিত হয়ে মরা জানোয়ার, হিংস্র পশু, শরাব ইত্যাদি নির্দিষ্ট দলীল দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

উপরোক্ত মৌলিক নীতি ছাড়াও আরও অনেক মূলনীতি রয়েছে যেমন:

১নং মূলনীতি

مَالاَيَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلاَّ بِه فَهُوَ وَاجِبٌ

যা ছাড়া কোন ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, তাও ওয়াজিব

২নং মূলনীতি

اِسْتِصْحَابُ الاَصْلِ

মূল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা।

৩নং মূলনীতি

اَنَّ الْخَيْرَ مَاأَرْضَى اللهَ وَاَنَّ الشَّرَّ مَاأَسْخَطَهُ

উত্তম তা, যা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে। আর মন্দ তা, যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

৪নং মূলনীতি

اَنَّ الْحَسَنَ مَاحَسَّنَهُ الشَّرْعُ وَاَنَّ القَبِيْحَ مَاقَبَّحَهُ الشَّرْعُ

হাসান (ভাল) তা, যাকে شارع (শরীয়ত প্রবর্তক) হাসান বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কবীহ (মন্দ) তা, যাকেشارع (শরীয়ত প্রবর্তক) কবীহ্ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

৫নং মূলনীতি

اَنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْمَطْعُومَاتِ وَالْمَلْبُوْسَاتِ وَالْمَشْرُوْبَاتِ وَالاَخْلاَقِ لاَتُعَلَّلُ وَيُلْتَزَمُ فِيْهَا بِالنَّصِّ

ইবাদত, খানা-পিনা, পোষাক পরিচ্ছদ এবং আখলাক ইত্যাদি বিষয়ে ‘নস’ (দলীল) এর অনুসরণ করা হবে, এর কারণ (عِلَّةٌ) বা বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিকতা তালাশ করা হবেনা।

৯.৩ শরঈ পরিভাষা সমূহ (التعاريف الشرعية)

حكم (হুকুম)ঃ বান্দার কাজ-কর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহর খেতাব বা সম্বোধনকে (خطاب) হুকুম বলা হয়।

فــرض (ফরয)ঃ যে কাজ করাকে শরী‘আতের পক্ষ থেকে দৃঢ়ভাবে চাওয়া হয় কিংবা যা কার্যকর করলে সওয়াব এবং অমান্য করলে শাস্তির ঘোষণা রয়েছে তাকে ফরয বলে।

حرام (হারাম)ঃ যে ব্যাপারে শরীয়তের পক্ষ থেকে চুড়ান্ত বা দৃঢ়ভাবে নিষেধ করা হয় কিংবা যা কার্যকর দরুন কেউ শাস্তির যোগ্য হয়, তাকে হারাম বলে।

৯.৪ কিছু বাস্তব বিষয়ের সংজ্ঞা (التعاريف غيرالشرعية)

বিবেক-বিবেচনা ভিত্তিক পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, সমাজ, চিন্তা ইত্যাদি হচ্ছে কিছু বাস্তব বিষয়, যার সংজ্ঞা সর্বজনের অনুভূতি গ্রাহ্য বাস্তবতা থেকে গৃহীত হয়।

৯.৪.১ চিন্তা (فكرة)

فكـــر (চিন্তা), عقـــل (বুদ্ধি), ادراك (উপলব্ধি) ইত্যাদি সব কিছু প্রায় একই অর্থবোধক। অর্থাৎ কোন বাস্তবতাকে যথা সম্ভব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন করার জন্য ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্য দিয়ে তাকে মানুষের মস্তিষ্কে পাঠানো এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সাথে তুলনা ও সমন্বয় করার যে প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে বিদ্যমান তাকেই বলা হয় ফিকির (فكر) বা চিন্তা। ফিকির পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত চারটি বিষয় বিদ্যমান থাকতে হয়।
(১) বাস্তব অবস্থা (২) সুস্থ মস্তিষ্ক (৩) ইন্দ্রিয়সমূহ এবং (৪) পূর্ব অভিজ্ঞতা/জ্ঞান।

ক. বিবেক-বিবেচনা ভিত্তিক পদ্ধতি (Rational Method)

এটি হচ্ছে এমন পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধিতে পৌঁছে। এ প্রক্রিয়ায় মানুষের মন তার স্বাভাবিক ক্ষমতা ব্যবহার করে চিন্তা সৃষ্টি করে। বস্তুত এটিই মানুষের চিন্তা করার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

প্রকৃতপক্ষে বিবেক-বিবেচনা ভিত্তিক পদ্ধতি (Rational Method) হচ্ছে কোন বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভের জন্য একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় চিন্তা-ভাবনার নাম। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে বাস্তবতা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি চিন্তাক্ষম মস্তিষ্কে নেয়া হয়; অতঃপর মস্তিষ্কে ও স্মৃতি ভান্ডারে রক্ষিত পূর্বেকার তথ্যের সাথে বর্তমান তথ্যের তুলনা, যাচাই-বাছাই ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। অবশেষে মানব মন বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে। এই সিদ্ধান্ত বা রায়টিই হচ্ছে বুদ্ধি প্রসূ

এই বিশেষ চিন্তা প্রক্রিয়াটি ভৌত বস্তু (যেমন পদার্থ বিদ্যা) সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হতে পারে অপরদিকে শুধু মাত্র চিন্তা-ভাবনার বিষয় যেমন আকীদা, আইন ইত্যাদি আলোচনায় অথবা ফিক্‌হ শাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি বুঝার ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র উপায়। কোন বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করার ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে মৌলিক এবং মানুষের একান্ত স্বভাবজাত পদ্ধতি। কেননা এটি হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ তার ভাবনা সমূহ এবং বস্তু সম্পর্কে তার জ্ঞানকে বুঝতে পারে। এটা মানুষের এক অনন্য ক্ষমতা যার মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ধারনায় পৌঁছে ।

খ. বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া (Scientific Method)

এটি হচ্ছে কোন কিছুর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে ঐ জিনিষটির কিছু বাস্তব অবস্থা জানার পদ্ধতি। আর এই প্রক্রিয়া শুধু ভৌত বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চিন্তা বা মনের উপর এর কোন প্রয়োগ নেই। তাই এই প্রক্রিয়া শুধু পরীক্ষণযোগ্য বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট।

এই প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে পরীক্ষাধীন বস্তুর উপর কিছু নতুন পরিবেশ ও অবস্থা আরোপ করার পর বস্তুর পরিবর্তিত অবস্থার সাথে প্রাথমিক তথা মূল অবস্থার তুলনামূলক বিচারের উপর। এই প্রক্রিয়ায় পরীক্ষণ শেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিমাপযোগ্য কিছু ফলাফলে উপনীত হতে হয়। আর তা সাধারণত গবেষণাগারেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক এই প্রক্রিয়ায় গবেষক যে ফলাফলে উপনীত হন তা কখনোই চুড়ান্ত (Absolute) নয় বরং সব সময়ই আপেক্ষিক। তাই এই ফলাফল সর্বদা ত্রুটিপূর্ণ অথবা ভুলের সম্ভাবনাযুক্ত। বস্তুত: ভুলের সম্ভাবনাকে সব সময় বিবেচনার মধ্যে রাখা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় গবেষণার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি।

আসলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিবেক-বিবেচনা ভিত্তিক প্রক্রিয়ার একটি শাখা মাত্র। এটা কখনোই চিন্তার মৌলিক ভিত্তি নয়। এটাকে ভিত্তি হিসাবে নেয়া সম্ভব নয় কেননা এটা থেকে চিন্তা উৎসারিত হয়না বরং অনুভূতি-বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা সৃষ্ট চিন্তাই এই প্রক্রিয়ার সূচনা করে, তাই এটি একটি উৎসের শাখা মাত্র। উপরন্ত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে মূল উৎস হিসাবে ধরে নিলে বেশীর ভাগ তথ্য ও বাস্তব ঘটনা গবেষণার বাইরে থেকে যাবে এবং জ্ঞানের এমন অনেকগুলো শাখা বাদ পড়ে যাবে যেগুলো নিয়ে যথেষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে আর এগুলোর সত্যিকার বাস্তবতাও বিদ্যমান। অধিকন্তু এ সব বিষয়ের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট এবং আমরা আমাদের অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এগুলোর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি[১]।

৯.৪.২. সমাজ (المجتمع)

সমাজ বলা হয় মানুষের এমন সমষ্টিকে যা একই চিন্তা, একই অনুভূতি-এবং একই ব্যবস্থার বন্ধনে আবদ্ধ। সমাজ হচ্ছে অনেক ব্যক্তির এমন সমন্বয়ের নাম, যেখানে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান। শুধু কতিপয় মানুষ একত্রিত হওয়াকেই সমাজ বলেনা। কারন অনেক মানুষ কোথাও একত্রিত হলে তাকে একটি দল বা সমাবেশ বলা যেতে পারে, একে সমাজ বলা যায় না। যে সব উপাদান একটি সমাজকে সংগঠিত করে, সে গুলো হচ্ছে কতিপয় সম্পর্ক তথা রীতি নীতি। অন্য কথায় বলা যায় সমাজ হচ্ছে ব্যক্তি, চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি এবং নিয়ম পদ্ধতিগুলোর সমষ্টির নাম। তাই কোন সমাজকে পরিশুদ্ধ

---

[১] **টীকা:** বিবেক বিবেচনা ভিত্তিক পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি কিছু অতি আলোচিত বাস্তব বিষয়। কিন্তু ইসলাম বিরোধী চিন্তাবিদদের অনেকে এ বিষয়গুলোকে অপব্যাখ্যা করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপপ্রয়োগ করে ইসলামের মৌলিক আকীদা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া শুধু মাত্র সসীম বিষয়ের জন্য প্রয়োগযোগ্য হওয়া সত্বেও তারা অসীম স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমানের ক্ষেত্রে কেবলই এই প্রক্রিয়াকেই ব্যবহার করার কথা বলেছেন। যে প্রক্রিয়ায় যেকোন সুস্থ চিন্তাক্ষম মানুষ সহজেই স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে অর্থাৎ বিবেক-বিবেচনা ভিত্তিক পদ্ধতিটিকে তারা এক্ষেত্রে এড়িয়ে গেছেন। একারণেই বিষয়গুলোর মৌলিক দিক এখানে তুলে ধরা হলো।

করতে হলে সে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের চিন্তা, অনুভূতি এবং সেখানে প্রচলিত নিয়ম-নীতি, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদির শুদ্ধতা সাধনের মাধ্যমেই কেবল তা করা সম্ভব। বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি, সমস্যা সমাধানের নিয়ম-পদ্ধতিগুলো ভিন্ন ভিন্ন। ঠিক এ কারণেই সমাজও হয় ভিন্ন ভিন্ন। যেমন ইসলামী সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ ইত্যাদি।

৯.৫ বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান মতাদর্শ সমূহ

(المبادئ الموجودة فى الدنيا)

বর্তমান বিশ্বে তিন ধরনের মতাদর্শ বিদ্যমান আছে।

১- ইসলাম।
২- গনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ।
৩- সমাজ তন্ত্র।

৯.৫.১ গনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ (الديمقراطية الرأسمالية)

এটি পশ্চিমা বিশ্ব এবং মার্কিনীদের মতবাদ। এই মতবাদ ধর্মকে রাষ্ট্র এবং জীবন থেকে আলাদা রাখার মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

"Render unto Caeser what is Caesar's and unto God what is God's"
বলা হচ্ছে "যা কিছু সিজারের (রাজার) তা তার মত কর, আর যা কিছু খোদার তা তার (খোদার) ইচ্ছার উপর ছেড়ে দাও।"

এ কারনে এই মতবাদে মানুষের জীবন ব্যবস্থার প্রবর্তক মানুষ নিজেই। এটি কুফুরী দৃষ্টি ভঙ্গি এবং ইসলামের সম্পূর্ন বিপরীত মতবাদ। কারণ বিধান প্রবর্তক এক মাত্র আল্লাহ তাআলা এবং তিনি সম্পূর্ন এককভাবেই মানুষের জীবনব্যবস্থা প্রনয়নকারী। তিনি রাষ্ট্রকে ইসলামী বিধি-বিধানের অংশে পরিনত করেছেন এবং জীবনের প্রতিটি বিষয়কে শরীআতের নীতি মোতাবেক যাপন করা বাধ্যতামূলক করেছেন। গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহন করা কিংবা এর চিন্তা-ভাবনাকে অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য হারাম। কারণ এর আদর্শ ও আইন-কানুন সবই কুফুরী এবং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

অধিকার বা স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

পুঁজিবাদী জীবনাদর্শে যে বিষয়গুলোর উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়, তার অন্যতম হচ্ছে ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি। এই স্বাধীনতাগুলো হল বিশ্বাসের স্বাধীনতা, মতামতের স্বাধীনতা, মালিকানার স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা। স্বার্থসর্বস্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির গোড়াপত্তনই হয়েছে মলিকানার স্বাধীনতার ফল স্বরূপ। এর ফলশ্রুতিতেই পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন জাতিকে উপনিবেশে পরিনত করে তাদের ধন-সম্পদ লুট করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে একচেটিয়াত্বের সুযোগ তৈরী করে নিচ্ছে।

উপরোক্ত চার প্রকার স্বাধীনতাই ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ কোন মুসলমান আকীদা ও বিশ্বাসগতভাবে স্বাধীন নয়। তাই কেউ যদি মুরতাদ হয়ে যায় অর্থাৎ ইসলাম ত্যাগ করে, তাহলে ইসলামের বিধান হচ্ছে তাকে বন্দি করে রাখা এবং সে যদি তওবা না করে, তাহলে তাকে হত্যা করা। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

"যে তার দ্বীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা কর।"

এমনিভাবে মত প্রকাশের ব্যাপারেও মুসলমানরা স্বাধীন নয়। বরং ইসলামের মতই একজন মুসলমানের মত। ইসলাম পরিপন্থী কোন মত পোষণ করা মুসলমানের জন্য জায়েয নয়।

কোন মুসলমান মালিকানার ব্যাপারেও স্বাধীন নয়। সে শুধু শরঈ ভিত্তিতেই কোন কিছুর মালিক হতে পারে। নিজের ইচ্ছা মতো কোন কিছুর মালিকানা দাবী করতে পারেনা। শরীআত মালিকানা লাভের যে সব উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে সে কোন বস্তুর মালিক হতে পারেনা। শরীআতের নিষিদ্ধ পথে মালিকানা অর্জন করা কখনও মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। তাই একজন মুসলমানের জন্য সুদ, একচেটিয়াত্ব, মজুতদারী অথবা মদ, শুকর বিক্রি করে বা অন্য কোন নিষিদ্ধ উপায়ে মালিকানা লাভ করা নিষিদ্ধ।

ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতারও কোন অস্তিত্ব নেই। কোন মুসলমান ব্যক্তিজীবনে স্বাধীন নয়। বরং প্রত্যেকেই শরীআতের অধীন। সুতরাং কেউ যদি নামায পড়া ছেড়ে দেয় কিংবা রোযা না রাখে অথবা নেশা করতে শুরু করে কিংবা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়,তাহলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। এমনি ভাবে মহিলারা যদি বেপর্দায় বাইরে চলা ফেরা করে,তাহলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। অতএব, পশ্চিমা পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সব

স্বাধীনতার কথা বলা হয় ইসলামে এমন স্বাধীনতার কোন অবকাশ নেই। এই লাগামহীন স্বাধীনতার চিন্তা সম্পূর্ন ভাবে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

পুঁজিবাদী মতাদর্শের অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে গণতন্ত্র

গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের মতামত

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হচ্ছে "জনগণের কর্তৃত্বাধীন, জনগণের জন্য, জনগণ দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা।" গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুনিয়াদি কথা হচ্ছে- সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে মানুষই সকল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সকল বিধি-বিধান কার্যকর করার ক্ষমতাও মানুষের। মানুষ নিজেই নিজের ইচ্ছা মত বিধি-বিধান প্রনয়ন করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে তাদের উপর কর্তৃত্ব করার আর কেউ নেই। তারা যে ভাবে ইচ্ছা সে ভাবে আইন প্রনয়ন ও প্রয়োগ করার অধিকারী। যদি কোন আইন রহিত করার ইচ্ছা হয়, তাও মানুষ করতে পারে। এ কাজে যদি মানুষ সরাসরি নিজে অংশ নিতে না পারে, তাহলে তারা এমন প্রতিনিধি নির্বাচন করবে, যে তাদের পক্ষ থেকে আইন প্রনয়ণ করার অধিকার রাখবে। যেহেতু দেশের সকল জনগণের পক্ষে একযোগে সরকার পরিচালনা করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার, তাই মানুষ নিজেদের প্রণীত আইনগুলো কার্যকর করার জন্য (অর্থাৎ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য) জন প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। মোট কথা পশ্চিমা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে জনগণই ক্ষমতার মূল উৎস। জনগণই শাসক এবং জনগণই আইন প্রবর্তক।

গণতন্ত্র নামী এ ব্যবস্থাটি কুফুরী। কারন এটি মানুষের নিজের বানানো ব্যবস্থা, ইসলামী শরীআতী ব্যবস্থা নয়। সুতরাং এই ব্যবস্থা দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করার অর্থ হচ্ছে কুফুর দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করা। তাই এই ব্যবস্থার প্রতি মানুষকে আহ্বান করার অর্থ কুফুরী ব্যবস্থার প্রতি মানুষকে আহ্বান করা। অতএব কোন অবস্থাতেই গণতন্ত্রের প্রতি আহ্বান করা বা তা অবলম্বন করা জায়েয নেই। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইসলামী শরীয়তের বিপরীত। কেননা মুসলমান মাত্রই সকল কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আহ্‌কাম মেনে চলতে বাধ্য। মুসলমান আল্লাহ্‌র গোলাম। সে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধানুযায়ী সকল কাজ সম্পাদন করবে।

মুসলিম উম্মাহ্'র জন্য এই বৈধতা নেই যে, তারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত আচরণ করবে। কারণ তাদের এই সার্বভৌমত্ব নেই। সকল সার্বভৌমত্ব শরীআতের তথা আল্লাহ্‌র। তাই উম্মাহ্‌র আইন প্রবর্তন করার কোন অধিকার নেই। আইন প্রণেতা হলেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ একত্রিত হয়েও যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হারাম করা কোন কিছুকে হালাল করতে চায়, তবু তারা তা করার অধিকার রাখেনা। যেমন সুদ, মজুতদারী, ব্যাভিচার, মদপান ইত্যাদি হারামগুলোর কোন একটিকে হালাল করার জন্য যদি সমগ্র উম্মাহ মিলেও আইন প্রনয়ণ করে, তবু তাকে হালাল বলা যাবেনা।

কোন মুসলমান যদি অব্যাহত ভাবে এ ধরনের কোন কিছু করার চেষ্টা করে, তাহলে প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তবে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বান্দাকে শাসনের দায়িত্ব তথা তাঁর বিধান কার্যকর করা ও তা সমাজে প্রচলন ঘটানোর অধিকার অর্পন করেছেন। উম্মাহ্'র অধিকার রয়েছে নিজের শাসক (খলীফা) নির্বাচন বা নিয়োগ করার। এটা এ জন্য করা হয় যেন শাসক আল্লাহ্র হুকুম কার্যকর করার ব্যাপারে উম্মাহ'র প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। শাসক নিযুক্ত করার পদ্ধতিও (বাই'আত) আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই পদ্ধতি দ্বারাই সার্বভৌমত্ব, অধিকার ও কর্তৃত্বের পার্থক্য নির্ণয় হয়ে যায়। উম্মাহ্র অধিকার হচ্ছে শাসক নির্বাচন করা। কর্তৃত্বের দায়িত্ব হচ্ছে খলীফার আর শাসনের মালিকানা এবং সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আল্লাহ্র।

৯.৫.২ সমাজতন্ত্র (الشيوعية)

সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজম হচ্ছে একটি বস্তুবাদী মতবাদ। যা বস্তু ছাড়া সব কিছুকেই অস্বীকার করে। এই মতবাদের দাবী হলো বস্তুই জগতের মূল উৎস; বস্তুর কোন আদি অন্ত নেই; এই বস্তু কোন স্রষ্টার সৃষ্টি নয় এবং সৃষ্টিকর্তা বলতে কিছুই নেই; এমনি ভাবে কেয়ামত দিবসেরও কোন বাস্তবতা নেই। এই মতবাদ ধর্মকে জনগণ ও জাতির জন্য আফিমের মত ক্ষতিকর মনে করে।

এই বস্তুবাদী মতাদর্শ বস্তু ও ইতিহাসের বিবর্তন তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্বানুসারে বস্তু নিজেই সকল সৃষ্টির মূল উৎস। আর বস্তুর বিবর্তনের মাধ্যমেই জগতের সব কিছু উৎপত্তি লাভ করে। কমিউনিজমের তত্ব অনুসারে সমাজব্যবস্থা উৎপাদনের হাতিয়ার থেকে উৎসারিত আর উৎপাদনের হাতিয়ারের উন্নয়নের সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে। এ মতবাদে সমাজ বলা হয় একটা ব্যাপক সমষ্টিকে, যা ভুমি, উৎপাদনের হাতিয়ার, প্রকৃতি এবং মানুষের সমন্বয়ে গঠিত। এই সব একই জিনিষ এবং তা হচ্ছে বস্তু। যখন প্রকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যস্থিত বস্তুর উন্নতি সাধিত হয়, তখন তার সাথে সাথে মানুষ এবং সমাজেরও উন্নতি সাধিত হয়।

একারনেই বস্তুবাদী মতাদর্শানুযায়ী সমাজ সদা বিবর্তনশীল। যদি সমাজের বিবর্তন ঘটে, তাহলে মানুষেরও বিবর্তন ঘটে। সমাজের সাথে সাথে মানুষও এমন ভাবে এগিয়ে যায় যেমনি ভাবে চাকার সাথে স্পোকগুলোও এগুতে বাধ্য হয়। কমিউনিজম উৎপাদন উপাদানের ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করেনা। এই মতবাদে সব কিছুর মালিকানা রাষ্ট্রের। কমিউনিজম একটি কুফুরী মতবাদ। এর চিন্তা কুফুরী, এর-ব্যবস্থা কুফুরী এবং সামগ্রিক ভাবেই তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

ইসলাম বলেছে এবং দলিল দ্বারা প্রমান করেছে যে,বস্তু হচ্ছে সৃষ্টি। এটা আদৌ "আযলী" বা অনাদি-অনন্ত নয়। একে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা এক সময় শেষ হয়ে যাবে। মানুষ,

জগত-সমূহ এবং এতে যা কিছু আছে সবকিছু একমাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তাআলার মাখলূক বা সৃষ্টি। জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসবে, বস্তুর উন্নতি কিংবা উৎপাদন উপাদান বা কোন মানুষের পক্ষ থেকে নয়। ইসলাম সমাজের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে সে অনুযায়ী সমাজ হলো মানুষ, মানুষের চিন্তা, অনুভূতি এবং ব্যবস্থাদির সমষ্টি। সমাজের পরিচয় নির্ণীত হয় সেখানে প্রচলিত মতাদর্শের পরিচয় অনুযায়ী। যদি কোন সমাজে ইসলামী মতাদর্শের প্রচলন এবং কর্তৃত্ব থাকে, তাহলে সে সমাজকে বলা হবে ইসলামী সমাজ; এখন সেখানকার উৎপাদন ব্যবস্থায় যে ধরনের হাতিয়ারেরই প্রাধান্য থাকুকনা কেন। অনুরূপ ভাবে যে সমাজে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র কার্যকর থাকে, তাকে বলা হয় পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ। যে সমাজে কমিউনিজম কার্যকর থাকে,তাকে বলা হয় কমিউনিষ্ট সমাজ যদিও সে সমাজে প্রচলিত উৎপাদন যন্ত্রপাতি হুবহু সেগুলোই থাকে, যে গুলো হয়তো বিদ্যমান আছে কোন পুঁজিবাদী সমাজে।

৯.৬ বস্তুগত উন্নতি ও সভ্যতা (الحضارة والمدنية)

সভ্যতা আসে জীবন সম্পর্কে মানুষের সামগ্রিক বিশ্বাস বা ধারনাবলী হতে। ইসলামী সভ্যতা, পশ্চিমা ও কমিউনিষ্ট সভ্যতা থেকে সম্পূর্ন আলাদা। কারণ এই প্রত্যেকটি সভ্যতার মাঝেই জীবন সম্পর্কে এমন একটি অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্র দৃষ্টি ভঙ্গি আছে, যা অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই মুসলমানের জন্য পশ্চিমা বা কমিউনিষ্ট সভ্যতার কোন কিছুই গ্রহন করা জায়েয নেই। কারণ এগুলোর উভয়টিই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

অপর দিকে বস্তুর বিভিন্ন ব্যবহারিক রূপ দু'ভাবে আসে। প্রথমতঃ সভ্যতা থেকে, দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রানীদের ছবি আঁকা বা মূর্তি তৈরী করা বস্তুকেই বিভিন্ন রূপ দেয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে কিন্তু যেহেতু এটি মুসলমানদের বিশ্বাসের চেয়ে ভিন্ন কোন বিশ্বাসের ধারক জনগোষ্ঠীর সভ্যতা বা জীবন ধারা থেকে এসেছে,তাই এগুলো গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে ব্যবহারিক জীবনের যে সব উপাদান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে এসেছে-যেমন আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম, আকাশযান, নৌযান, সড়কযান, কৃষি ও শিল্পখাতের উপাদান, যুদ্ধের আধুনিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার ইত্যাদি সব কিছুই আন্তর্জাতিক সামগ্রী। এগুলো সারা বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য এবং কোন বিশেষ সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত নয়। এমন কি কোন বিশেষ জাতি-গোষ্ঠী কিংবা ধর্মের কোন একচেটিয়া অধিকারও এগুলোর উপর নেই। বরং এগুলো সব মানুষের জন্য উম্মুক্ত। কারণ জীবন সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন দৃষ্টি ভঙ্গির সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। অতএব, যেহেতু এসব বস্তু তৈরী বা ব্যবহারের ব্যাপারে ইসলামী আকীদার সাথে কোন বৈপরিত্য নেই, সেহেতু মুসলমানদের জন্যও এগুলো আবিষ্কার, উন্নয়ন ও ব্যবহার করা জায়েয। বরং ক্ষেত্রবিশেষে এগুলো অর্জন করা ফরযে কিফায়াও বটে।

৯.৭ ইসলামে শাসন ব্যবস্থা (نظام الحكم فىالاسلام)

ইসলামী সরকারঃ ইসলাম তার শাসন ব্যবস্থার সীমা নির্ধারন করে দিয়েছে এই বক্তব্য দিয়ে যে, ইসলামী শাসন হবে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আহ্‌কাম মোতাবেক।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"আর আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করুন তা দিয়ে যা আল্লাহ্‌ অবতীর্ন করেছেন। আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরন করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন; যেন তারা আপনার নিকট আল্লাহ্‌র প্রেরিত কোন বিধান থেকে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে।" [মায়িদা, ৪৯]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

"অতএব আপনি তাদের মাঝে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানাবলী দ্বারা ফয়সালা করুন এবং আপনার নিকট যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।" [মায়িদা, ৪৮]

সুতরাং যে সরকার আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান তথা কুরআন ও সুন্নাহ্‌ ভিত্তিক আহকাম দ্বারা শাসন করে তাকেই শুধু বলা যাবে ইসলামী সরকার বা কর্তৃপক্ষ।

৯.৮ ইসলামী সরকার ব্যবস্থা (السلطان الاسلامى)

ইসলাম সরকার ব্যবস্থা হিসাবে একমাত্র খিলাফতকে নির্ধারন করে দিয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য খিলাফত ব্যবস্থাই হচ্ছে একমাত্র ব্যবস্থা। ইমাম মুসলিম (রহঃ)- হযরত আবু হাযিম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর নিকট পাঁচ বৎসর কাটিয়েছি। আমি শুনতাম তিনি রাসূল (সাঃ) এর এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন,

كَانَتْ بَنُوْ اِسرَائِيْلَ تَسُوسُهُمُ الاَنبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَاِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرْ

"বনী ইসরাঈলের সিয়াসাত (তত্বাবধান) করতেন নবীগন। যখন এক নবী চলে যেতেন অপর নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আমার পর আর কোন নবী আসবেনা বরং অনেক সংখ্যক খলীফা হবেন।"

এ ক্ষেত্রে এ হাদীসটি সুস্পষ্টভাবে এ বার্তা বহন করে যে, রাসূল (সাঃ) এর পর ইসলামী সরকার ব্যবস্থা খিলাফত আকারে বহাল থাকবে। এ ছাড়াও এর সপক্ষে আরো অনেক হাদীস বিদ্যমান আছে। যেমন سيكون بعدى ائمة (আমার পর ইমামগণ থাকবে...) اِذَابُوْيِعَ لِلْخَلِيْفَتَيْنِ (যখন দুই খলীফার জন্য বাইআত গ্রহণ করা হবে...) ইত্যাদি। এছাড়া আরও হাদীস বর্ণিত আছে যা প্রমান করে যে, খিলাফতই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার একমাত্র রূপ।

৯.৮.১ খলীফা নিয়োগ করার পদ্ধতি (طريقة نصب الخليفة)

ইসলাম খলীফা নিয়োগ করার পদ্ধতি নির্ধারন করে দিয়েছে। সেই নির্ধারিত পদ্ধতিটি হচ্ছে বাই'আত। হযরত নাফে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আমি হযরত উমর রা. কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা গেল যে, তার ঘাড়ে কোন (খলীফার) বাই'আত নেই, সে জাহেলী মরণ মরল।"

হযরত উবাদা ইবন সামিত (রাঃ) বর্ণনা করেন,

بَايَعْنَارَسُوْلَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنْ لاَّ نُنَازِعَ الاَ مْرَ اَهْلَهُ وَاَنْ نَّقُوْمَ اَوْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَنَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

"আমরা রাসূল (সাঃ) এর নিকট সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় শ্রবন ও আনুগত্য করার শপথ নিয়েছি। একথার উপরও শপথ নিয়েছি যে, আমরা উলূল আমর (খলীফা)-এর সাথে বিবাদ করবনা। আমরা এই মর্মেও শপথ নিয়েছি যে, হকের জন্য উঠে দাঁড়াবো কিংবা হক কথা বলব যে অবস্থায়ই থাকিনা কেন। আর আল্লাহ্‌র কাজের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবো না।"

অন্য এক হাদীসে আছে,

اِذَابُوْيِعَ لِلْخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا

"যদি দুই খলীফার জন্য বাই'আত নেয়া হয়, তাহলে তোমরা দ্বিতীয় জনকে হত্যা কর।"

এই সমস্ত হাদীস স্পষ্ট ভাবে প্রমান করে যে, খলীফাকে তার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে বাই'আত। সাহাবাগণের ইজমা দ্বারাও একথা প্রমান হয়েছে। তাই যখনই সরকার বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব খিলাফত ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন খলীফার নিযুক্তি বাইআতের মাধ্যমেই হবে। খিলাফতের অন্যতম শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান তথা কুরআন ও সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত হওয়া। মূলত এটাই ইসলামী শরঈ সরকার বা ইসলামী কর্তৃত্ব। মুসলমানরা যখন কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে এবং তাকে বাই'আত দেয়, তখনই সে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত খলীফা হয় এবং তার আনুগত্য করা সকলের জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।

আর এ কারণেই রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও ইসলামী ব্যবস্থা নয়। ইসলাম রাজতন্ত্রকে কখনও অনুমোদন দেয়না। চাই তা নামে মাত্র রাজতন্ত্র হউক- যেমন বৃটেনের রাজতন্ত্র। কিংবা কর্তৃত্বশালী রাজতন্ত্র হউক- যেমন সউদী আরব ও জর্ডানের রাজতন্ত্র।কেননা খলীফা কখনো নামে মাত্র শাসক হন না। বরং তিনি হন শরীআত কার্যকর করার ক্ষমতাবান শাসক এবং উম্মাহ'র প্রতিনিধি। আর খিলাফত রাজতন্ত্রের মত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন ক্ষমতা নয়। এ ক্ষেত্রে জনগণ খলীফা নির্বাচন করে এবং তাকে বাইআত দেয়। একজন খলীফা কোন সাধারণ মুসলমানের চেয়ে অতিরিক্ত কোন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখেন না। তিনি কোন অবস্থাতেই শরীআহ আইনের উর্ধ্বে নন। অথচ বাদশাহরা নিজেদেরকে জবাবদিহিতার উর্ধ্বে-মনে করে থাকে। খলীফা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের অধীন। তার কাজ-কর্মের ব্যাপারে তিনি জবাবদিহিতার মুখোমুখী হতে বাধ্য।

প্রজাতন্ত্রও একটি অনৈসলামিক ব্যবস্থা। ইসলাম কখনও এর অনুমতি দেয়না। চাই তা যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রেসিডেন্সিয়াল হউক অথবা জার্মানির মত সংসদীয় হউক। কারণ প্রজাতন্ত্র তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্টিত হয়, যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার মূল মালিক মনে করা হয় জনগনকে। অথচ খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামের এই বুনিয়াদী বিশ্বাসের উপর যে, সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ্। তাই রাষ্ট্র,সমাজ ও ব্যক্তি ইত্যাদি সকলক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত শরীআতের সিদ্ধান্তই হচ্ছে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সুতরাং জনগণ শরীআহ নির্ধারিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নিজেদের পছন্দমত খলীফা মনোনীত ও নিয়োগ করার অধিকার রাখলেও যখন তখন ইচ্ছামত তাকে অপসারণ করতে পারে না বরং শরীআতের হুকুমই কেবল পারে খলীফাকে অপসারন বা পদচ্যুত করতে। অর্থাৎ যখন কোন খলীফা শরীআতের বিপক্ষে অবস্থান নিবে তখন তাকে

ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। খলীফা শরীআ'তের বিপক্ষে কাজ করেছে কিনা-তা বিবেচনা করার আইনগত কর্তৃপক্ষ হচ্ছে বিচার বিভাগ। এই বিভাগেরই অধিকার আছে খলীফাকে শরী'আতের খেলাফ কাজ করার দরুন মা'যুল বা পদচ্যুত করার। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমরা যদি বিবাদে লিপ্ত হও,তাহলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট।" [নিসা, ৫৯]

এ আয়াতে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নিকট উপস্থাপন করার যে কথা বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিধানের নিকট উপস্থাপন করা। আর তার কার্যকরী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে محكمة المظالم (মাহকামাতুল মাযালিম) বা শরীআহ আদালতের সেই বিভাগ যা শাসকদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করে এবং তাদের পক্ষ থেকে কোন যুলম প্রকাশিত হলে তার বিচার করে। পক্ষান্তরে প্রজাতন্ত্রের সরকার প্রধানকে জনগণ তাদের ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার অধিকার রাখে। কারন এ ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের মালিক।

খলীফা কোন বিশেষ বা নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন না। বরং তিনি ততক্ষনই ক্ষমতায় থাকার অধিকারী থাকেন, যতক্ষন ইসলামকে কার্যকর (نافذ) রাখেন । যদি তিনি ইসলাম কার্যকর না করেন, কেবল তখনই তাকে ক্ষমতাচ্যুত বা অপসারন করা যায়। যদিও তিনি এক মাস আগেই নিযুক্ত হন না কেন। অথচ প্রজাতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তাছাড়া সংসদীয় পদ্ধতির গণতন্ত্রে প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি একজন প্রধান মন্ত্রীও থাকেন। আর সেক্ষেত্রে নির্বাহী ক্ষমতার দিক থেকে প্রেসিডেন্টের পদটি একটি আলংকরিক পদে পরিনত হয়। যে পদে থেকে প্রেসিডেন্ট কোন নির্দেশ জারি করার অধিকার রাখেন না। সে অবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। আর খিলাফত ব্যবস্থায় প্রধান নির্বাহী থাকেন খোদ খলীফা। তিনিই সরাসরি আদেশ জারি করেন এবং তিনিই তা কার্যকর করেন। তার সাথে শাসনকর্তা হিসাবে কোন মন্ত্রীসভা থাকেনা ।

প্রেসিডেন্সিয়াল গণতন্ত্রে যদিও প্রেসিডেন্টই প্রকৃত শাসক কিন্তু তার সাথে ক্ষমতার অংশীদার মন্ত্রীবর্গও থাকেন এবং তিনি হন তাদের সকলের প্রধান আর তার পদ হয়

রাষ্ট্রপ্রধানের। এর বিপরীত চিত্র পাওয়া যায় খিলাফত ব্যবস্থায়। যেখানে খলীফাই হন সরাসরি শাসনকর্তা। তার সাথে যারা প্রশাসনিক কাজ করেন, তারা থাকেন সহযোগী (معاون) হিসাবে। তিনি তাদের সহযোগিতা নেন কিন্তু তারা ক্ষমতার অংশীদার মন্ত্রীর অবস্থানে থাকেন না। খিলাফত ব্যবস্থায় খলীফা যখন শাসক নিযুক্ত হন, তখন তিনি রাষ্ট্র প্রধান হিসাবেই শাসন করেন এবং তিনি নির্বাহী পরিষদের প্রধান হিসাবে নয় বরং একক দায়িত্বেই তা করে থাকেন। যেহেতু খিলাফত ব্যবস্থা ও প্রজাতন্ত্রের মাঝে অনেক সুস্পষ্ট ও মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে, সেহেতু কোন ইসলামী রাষ্ট্রকে 'ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' বলা জায়েয নেই। ঠিক এমনিভাবে এরকম বলাও সম্পূর্ণ ভুল যে, ইসলামী সরকার হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক অথবা ইসলাম হচ্ছে এক ধরনের প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

৯.৮.২ খিলাফত শুধু একটি হওয়া (وحدة دولة الخلافة)

ইসলামী শাসন তথা খিলাফত ব্যবস্থা হচ্ছে একক ব্যবস্থা। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় নেতৃত্ব ও প্রশাসন থাকবে একটাই। বিষয়টি এমন নয় যে, বিভিন্ন দেশের সরকার একত্রিত হয়ে একটি ঐক্য বা ফেডারেল সরকার গঠন করবে। কারন মুসলমানদের জন্য একই সময়ে একাধিক ইসলামী সরকার থাকা জায়েয নেই। অনুরূপ ভাবে এমন একাধিক খলীফা থাকাও জায়েয নেই, যারা মুসলমানদের মাঝে একই সময়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ তথা শরীআ'ত কার্যকর করবেন। এ সিদ্ধান্ত শরীআ'তই দিয়েছে। এর অন্যথা করা কোন ভাবেই জায়েয নেই। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-আমি আল্লাহ্র রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছি যে,

وَمَنْ بَايَعَ اِمَاماً فَاَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَده وَثَمَرَةَ قَلْبه فَلْيُطعْهُ
فَاِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرَ

"যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বাই'আত প্রদান করল, সে যেন তাকে নিজ হাতের কর্তৃত্ব ও স্বীয় অন্তরের ফল (অর্থাৎ সব কিছু) দিয়ে দিল। এর পর তার উচিৎ উক্ত ইমামের আনুগত্য করা। যদি অন্য কেউ এসে (প্রথম নিযুক্ত) খলীফার সাথে (ক্ষমতার ব্যাপারে) বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে দ্বিতীয় জনের গর্দান উড়িয়ে দাও।"

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর বর্ণিত এক হাদীসে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেন,

اِذَابُوْيِعَ لِلْخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ منْهُمَا

"যখন দুই খলীফার জন্য বাই'আত নেওয়া হয়, তখন দ্বিতীয় জনকে হত্যা কর।"

হযরত আরফাজাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছি যে,

مَنْ اَتَاكُمْ وَاَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ يُرِيْدُ اَنْ يَّشُقَّ عَصَاكُمْ اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

"তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় কেউ এসে যদি তোমাদের সারিতে ফাটল সৃষ্টি করতে চায় কিংবা তোমাদের দলে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়, তাকে হত্যা কর।"

এ সকল হাদীস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয় যে, মুসলমানদের একাধিক খলীফা (একই সময়ে) থাকা জায়েয নেই। একজন খলীফা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অথবা এক জনের বাই'আতের পর যদি দ্বিতীয় জনের বাই'আত নেওয়া হয়, তাহলে প্রথম জনই খলীফা হিসাবে বহাল থাকবেন। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজে সরে না দাঁড়ায়, তাহলে শরী'আতের বিধান মত তাকে হত্যা করা হবে। এক খলীফার বর্তমানে যদি অপর কেউ খিলাফতের দাবী করে কিংবা রাষ্ট্রকে বিভক্ত করার বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। এ কথা সম্পূর্ণ পরিস্কার যে, মুসলমানদের একাধিক রাষ্ট্র থাকা জায়েয নেই। আর এ কথাও পরিস্কার যে, মুসলমানদের সরকার কোন ফেডারেল সরকার হবেনা বরং এককভাবে একটি সরকারই থাকবে।

৯.৯ ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি সমূহ (قواعد الحكم فى الاسلام)

ইসলামী রাষ্ট্র চারটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৯.৯.১ সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র,কখনই মানুষের নয়

(السيادة للشرع لا للأمة)

মুসলমান তথা উম্মাহ'র জীবনের সব কিছু পরিচালিত হবে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত হালাল-হারামের বিধান অনুযায়ী, ব্যক্তি মুসলমান কিংবা উম্মাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী নয়। মুসলমানগণ ব্যক্তিগত ও উম্মাহ্‌ হিসাবে সর্বদা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের অনুগামী থাকবে। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর ন্যস্ত করে।" [নিসা, ৬৫]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা কোন মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অধিকার থাকবে না।" [আল-আহযাব, ৩৬]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমরা যদি বিবাদে লিপ্ত হও,তাহলে তা উপস্থাপন কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট।" [নিসা, ৫৯]

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعاً لِماَ جِئْتُ بِه

"তোমাদের কেউ ততক্ষন পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবেনা, যতক্ষন না তার প্রবৃত্তি আমি যা আনয়ন করেছি তার অনুগত হয়।"

উপরোক্ত দলীলসমূহ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের নয় বরং শরী'আতের।

৯.৯.২ হুকুমতের কর্তৃত্ব উম্মাহ্'র অধিকারে (السلطان للأمة)

শরী'আত খলীফা নিয়োগ করার পদ্ধতি হিসাবে উম্মাহ্কে বাই'আতের মাধ্যমে যে অধিকার দিয়েছে, এ থেকে বুঝা যায় যে, হুকুমত বা সরকার গঠনের কর্তৃত্ব/অধিকার হচ্ছে উম্মাহ্'র। বাই'আতের মাধ্যমে খলীফা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন বটে, কিন্তু তিনি উম্মাহ্'র পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। হুকুমত যেহেতু উম্মাহ্'র অধিকারে, তাই বাই'আতের মাধ্যমে তারা যাকে ইচ্ছা (শরীআ'ত বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে) তাকে তা দান করতে পারে। অনেক হাদীস দ্বারা এ কথার প্রমান পাওয়া যায় যে, আমীর বা নেতা নির্বাচন করার দায়িত্ব উম্মাহ্'র। যেমন হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন,

لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْنَ بِفَلاَةٍ مِّنَ الاَرْضِ اِلاَّ اَمَّرُوا عَلَيْهِمْ اَحَدَهُمْ

"তিন ব্যক্তিও যদি কোন উন্মুক্ত ময়দানে থাকে, তাহলে আমীর ব্যতীত চলা তাদের জন্য জায়েয নয়, বরং নিজেদের মধ্য থেকে তারা একজনকে আমীর নিযুক্ত করবে।"

এ থেকে প্রকাশ পায় যে, নেতা মনোনয়ন ও নিযুক্ত করার অধিকারী তথা দায়িত্বশীল হচ্ছে উম্মাহ্। বাই'আত সংক্রান্ত হাদীস থেকেও প্রমাণ হয়েছে যে, নেতৃত্ব কায়েম হবে উম্মাহ্র পক্ষ থেকে।

৯.৯.৩ খলীফা একজন হওয়া আবশ্যক (وجوب ان يكون الخليفة واحدا)

সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একজনমাত্র ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্ত করা এবং তার আনুগত্য করা ফরয হওয়ার বিষয়ে অনেকগুলো হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের ইজমাও এর প্রমান বহন করে।

৯.৯.৪ রাষ্ট্রে শরঈ হুকুম বাস্তবায়ন করার অধিকার একমাত্র খলীফার

(للخليفة وحده حق تبنى الأحكام الشرعية التى تطبق فى الدولة)

একমাত্র খলীফারই অধিকার আছে শরঈ হুকুম অবলম্বন (Adopt) এবং তা রাষ্ট্রে বাস্ত বায়ন করার। তাছাড়া সাংবিধানিক ও অন্যান্য আদেশ জারি করার অধিকারও খলীফারই। একথা সাহাবায়ে কিরামের ইজমা দ্বারা প্রমানিত যে, শুধু খলীফারই অধিকার রয়েছে আহকামাত এখতিয়ার করার। নিম্মোক্ত নীতিসমূহ ইজমায়ে সাহাবা থেকে গ্রহন করা হয়েছে,

اَمْرُ الاِمَامِ يَرْفَعُ الخِلاَفَ

ইমামের নির্দেশ মতভেদ দূর করে।

اَمْرُ السُّلْطَانِ نَافِذٌ

সুলতান তথা শরঈ কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তির নির্দেশ কার্যকর হয়ে থাকে।

لِلسُّلْطَانِ اَنْ يُّحْدِثَ مِنَ الاَقْضِيَةِ بِقَدْرِ مَايُحْدِثُ مِنْ مُشْكِلاَتٍ

সকল উদ্ভুত সমস্যার সমাধান জারি করার অধিকার একমাত্র সুলতানের।

৯.১০ ইসলামী সরকারের কাঠামো

(شكل نظام الحكم فى الاسلام)

সরকারের কাঠামো গঠিত হবে নিম্নবর্ণিত রুকন গুলোর (Components) সমন্বয়ে

১. خليفة খলীফা

২. معاون التفويض প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত সহযোগী

৩. معاون التنفيض নির্বাহী সহযোগী

৪. امير الجهاد আমীরে জিহাদ

৫. الولاة গভর্নর বৃন্দ

৬. القضاة বিচার বিভাগ

৭. الجهاز الادارى لمصالح الامة প্রশাসনিক বিভাগ

৮. مجلس الامة মজলিসুল উম্মাহ্ (পরামর্শ সভা)

৯. الجيش সেনা বাহিনী।

রাষ্ট্রের এই রুকনগুলো (Components) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নাহ্ থেকে সংগৃহীত। তিনি রাষ্ট্রের জন্য একটি কাঠামো তৈরী করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন রাষ্ট্র প্রধান। এমনিভাবে তিনি মুসলমানদেরকে নিজেদের খলীফা নিযুক্ত করারও নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবূ বকর এবং উমর (রাঃ) কে রাসূল (সাঃ)নিজের সহযোগী নিযুক্ত করেছিলেন। যেমন তিরমিযি শরীফে বর্ণিত আছে যে,

وَزِيْرَاىَ مِنْ اَهْلِ الاَرْضِ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ

"পৃথিবীবাসীর মধ্যে আমার দুই সহযোগী হচ্ছে আবূ বকর এবং উমর।"

আভিধানিক অর্থে উযির বলা হয় সহযোগীকে (معـــاون)। উযির বলতে এখানে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক সরকারের মন্ত্রীকে বুঝানো হয়নি।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেমনিভাবে জিহাদের আমির নিয়োগ করেছেন, তেমনিভাবে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর (ওয়ালী) ও নিযুক্ত করেছেন। যেমন হযরত মুআয (রাঃ) কে ইয়ামানের এবং মক্কা বিজয়ের পর হযরত উতবা ইবনে উসাইদ (রাঃ) কে মক্কার গভর্নর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বিচারকও নিযুক্ত করেছেন যারা মানুষের বিবাদ বিসম্বাদের ফয়সালা

করতেন। যেমন হযরত আলী (রাঃ) কে ইয়ামানের কাজী নিযুক্ত করেছিলেন এবং হযরত রাশেদ বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) কে করেছিলেন محكمة المظالم (মোহকামাতুল মাযালিম) সহ পুরো বিচার বিভাগের প্রধান। তিনি (সাঃ) জনপ্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে সচিবও নিয়োগ করেছেন। তাঁরা সবাই ছিলেন বিভাগীয় প্রধানের স্থলাভিষিক্ত । যেমন হযরত মুআইকিব বিন আবি ফাতিমাকে (রাঃ) গনীমতের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামানকে (রাঃ) নিয়োগ করেছিলেন হিজাজের ফসলের উপর ধার্যকৃত যাকাত (উশর) আদায়ের দায়িত্বশীলের পদে।

শুরা বা মজলিসুল উম্মাহ্‌র (সাধারণ সভা) ব্যাপারটি হচ্ছে এমন যে, রাসূল (সাঃ) এর নিয়মিত এবং নির্ধারিত কোন পরামর্শ সভা ছিলনা। বরং তিনি যখন চাইতেন, তখন মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করতেন। যেমন উহুদের দিনে তিনি মুসলমানদেরকে একত্রিত করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। কোন কোন সাহাবী এমন ছিলেন, যাঁদের সাথে রাসূল (সাঃ) নিয়মিত পরামর্শ করতেন। তাঁরা ছিলেন সমাজের নকীব (নেতৃস্থানীয়) পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব।

এর মধ্যে হযরত হামযা, আবূ বকর, উমর, জাফর, আলী, ইব্‌ন মাসউদ, সালমান, আম্মার, হুযায়ফা, আবুযর, মিকদাদ, সাআদ ইব্‌ন উবাদা এবং সাআদ ইব্‌ন মুআয (রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) প্রমূখ সাহাবাগন শামীল ছিলেন। তাঁরা মজলীসে একত্রিত হতেন আর আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) তাদের থেকে পরামর্শ নিতেন। তিনি একটি সেনাবাহিনীও গঠন করেছিলেন। খোদ নিজে ছিলেন এর সর্বাধিনায়ক। মাঝে মাঝে কোন কোন যুদ্ধে অন্যদেরকেও কমান্ডার নিযুক্ত করতেন।

৯.১১ রাজনৈতিক দল (الاحزاب السياسية)

রাজনৈতিক দল গঠন করা মুসলমানদের শরঈ অধিকার। যেন এর দ্বারা শাসকদেরকে জবাবদিহিতার মুখোমুখী করা যায় কিংবা যেখানে ইসলাম কায়েম নেই সেখানে ইসলাম কায়েমের জন্য উম্মাহ্‌র সমর্থনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়। তবে শর্ত হলো দলগুলো গঠন হতে হবে ইসলামী মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে। আর ঐ সব দল যে নিয়মনীতি ও সমাধান অবলম্বন করবে, সেগুলো হতে হবে শরঈ আহকাম এবং শরঈ সমাধান। রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য কোন অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। এসব দল একাধিকও হতে পারে।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلْتَكُن مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِوَاُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যানের প্রতি আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং এরাই সফলকাম।"
[সূরা আলি ইমরান, ১০৪]

৯.১২ শাসকদের জবাবদিহিতা (محاسبة الحكام)

আল্লাহ্ তাআলা শাসকদের আনুগত্য করা এবং তাদের কাজ-কর্ম ও আচরণগুলো তদারক করার নির্দেশ দিয়েছেন। শরীআ'ত এ ব্যপারে মুসলমানদের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। যখন শাসকরা নাগরিক সাধারনের উপর যুলুম করে, নিজের দায়িত্ব–পালনে অবহেলা করে কিংবা উম্মাহ্'র স্বার্থ উপেক্ষা করে, অথবা কোন শরঈ হুকুমের বিরোধিতা করে বা আল্লাহ্র নাযিলকৃত আহকাম মোতাবেক শাসন না করে,তখন তাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

"জালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা উত্তম জিহাদ।"

তিনি আরো বলেন,

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ وَرَجُلٌ قَامَ اِلَى اِمَامٍ جَائِرٍ فَنَصَحَهُ فَقَتَلَه

"শহীদদের সর্দার হামযা এবং ঐ ব্যক্তিও, যে অত্যাচারী শাসকের সামনে দাড়িয়ে উপদেশ দেওয়ার পর (ঐ শাসক) তাকে হত্যা করে ফেলে।"

৯.১৩ যে শাসক ইসলাম অনুযায়ী শাসন করে তার আনুগত্য করা ফরয

(طاعة من يحكم بالاسلام فرض مالم يأمر بمعصية)

ইসলাম অনুযায়ী পরিচালিত শাসনের আনুগত্য করা মুসলমানদের উপর ফরয। অর্থাৎ এমন শাসকের আনুগত্য করা ফরয, যিনি আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আহকাম দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করেন, কোন গুনাহের নির্দেশ জারী করেন না এবং তার শাসনে স্পষ্ট কুফর প্রকাশ পায়না। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী।" [নিসা, ৫৯]

মোট কথা মুসলিম শাসকের আনুগত্য ততক্ষন পর্যন্ত বাধ্যতামূলক, যতক্ষন পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত আহকাম দ্বারা শাসন করে এবং কোন গুনাহের নির্দেশ না দেয়। যদি কোন গুনাহের কাজ করার নির্দেশ দেয়, তাহলে তার আনুগত্য করা জায়েয নয়।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেন,

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

"মুসলমানের জন্য পছন্দনীয় অপছন্দনীয় উভয় অবস্থায় আমীরের কথা শোনা এবং তার আনুগত্য করা ততক্ষন পর্যন্ত বাধ্যতা মূলক, যতক্ষ না সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ দেয়। যদি সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী বা অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়, তাহলে তার কথা শোনাও হবেনা এবং আনুগত্যও করা হবেনা।"

৯.১৪ কোন শাসকের বিরুদ্ধে ততক্ষন পর্যন্ত বিদ্রোহ করা হারাম, যতক্ষন না সে সুস্পষ্ট কুফর দ্বারা শাসন শুরু করে।

(الخروج على من يحكم بالاسلام حرام الا اذا حكم بالكفر الصراح)

কোন শাসকের বিরুদ্ধে ততক্ষন পর্যন্ত বিদ্রোহ করা হারাম, যতক্ষন পর্যন্ত সে ইসলাম অনুযায়ী শাসন চালায় যদিও সে ছোটখাট অত্যাচার মূলক কাজ করে। তার এই অত্যাচারের বিষয়ে তাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখী করতে হবে। কিন্তু এই ছোটখাট অত্যাচারের কারনে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা যুদ্ধ করা জায়েয নেই।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ حَتّى يُرَاجِعَهُ

"যে ব্যক্তি জামাআত (উম্মাহ্) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সে তার গলদেশ থেকে ইসলামের হার খুলে ফেলেছে। (এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে) যতক্ষন না সে আবার ফিরে আসবে।"

আরো এমন অনেক হাদীস আছে, যেগুলোতে শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যদিও তারা অত্যাচার করে। তবে স্পষ্ট কুফুরীতে লিপ্ত হলে তখনকার হুকুম ভিন্ন অর্থাৎ তারা যদি এমন ভাবে কুফুরীতে লিপ্ত হয় যে, অকাট্য দলীল দ্বারা তা প্রমানীত হয় এবং তাতে কোন প্রকার সংশয় না থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করতে হবে।

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) বলেন,

سَتَكُونُ اُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ اَنْكَرَ
سَلِمَ وَلكِنْ مَّنْ رَضِىَ وَتَابَعَ قَالُوا اَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَاصَلُّوا

"অচিরেই এমন কিছু আমীরের আবির্ভাব হবে,যাদের মাঝে তোমরা মা'রূফও পাবে এবং মুনকারও পাবে। সুতরাং যে মা'রূফ করবে সে দায় মুক্ত। আর যে মুনকারকে অস্বীকার করবে সে নিরাপদ। তবে যে ঐ আমীরদের উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং পদের আনুগত্য করবে সে দায়মুক্তও নয় নিরাপদও নয়। সাহাবাগন আরয করলেন, আমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবনা ? তিনি বললেন, না। যতক্ষন পর্যন্ত তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত রাখে।"

এখানে সালাত প্রতিষ্ঠা বলে ইংগিত করা হয়েছে ইসলাম অনুযায়ী শাসনকে। ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আউফ ইবনে মালিকের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন,

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ

"বলা হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি তরবারীর বলে তাদেরকে অপসারন করব না ? তিনি বললেন-না। যতক্ষন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে সালাত কায়েম রাখবে।"

হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে আছে, "এবং এই মর্মেও আমরা (রাসূল (সাঃ) এর সাথে) শপথ করেছি যে, উলূল আমর যতক্ষন না প্রত্যক্ষ কুফুরীতে লিপ্ত হবে, ততক্ষন পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না....."

৯.১৫ ইসলামে অর্থনৈতিক নীতিমালা

(احكام فىالنظام الاقتصادى فىالاسلام)

হিযবুত তাহ্‌রীর অর্থনীতি বিষয়ে রচিত "ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" নামক গ্রন্থে একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছে। যেখানে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজম ইত্যাদি মতাদর্শ থেকে উৎসারিত অর্থনৈতিক চিন্তাগুলোর বিস্তারিত সমালোচনা করা হয়েছে। বইটিতে এসব কুফর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মন্দ দিকগুলো তুলে ধরে এগুলোর সাথে ইসলামী অর্থনীতির সাংঘর্ষিক দিকগুলোকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৯.১৫.১ ইসলামী অর্থনীতি (سياسة الاقتصاد فىالاسلام)

ইসলামী অর্থনীতি প্রতিটি নাগরিকের সকল মৌলিক চাহিদা পূরনের গ্যারান্টি দেয়। এছাড়া অতিরিক্ত কিছু চাহিদা পূরণের পথও সুগম করে। তবে একথা প্রত্যেক নাগরিককে মেনে নিতে হবে যে, সে ইসলামী সমাজে বাস করছে এবং এর একটি বিশেষ জীবন পদ্ধতি আছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, শরঈ আইন প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা তথা অন্ন,বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার গ্যারান্টি দেয়। এর প্রক্রিয়া হলো এই যে, কোন ব্যক্তি যদি কর্মক্ষম হয় তাহলে ইসলাম তার নিজের এবং তার উপর যাদের ভরণ পোষনের দায়িত্ব রয়েছে, তাদের জীবিকা উপার্জনার্থে কাজ করা তার জন্য আবশ্যক করে দেয়। তাই পিতার উপর ফরয হয়ে যায়, তার সন্তানের জীবিকার ব্যবস্থা করা। যদি কোন ব্যক্তি কাজ করতে অক্ষম হয়, তখন তার দায়িত্ব অর্পন করা হয় তার ওয়ারিশদের উপর। তবে যদি তার দায়িত্ব পালন করার মত উপযুক্ত কাউকে না পাওয়া যায়, তখন তার দায়িত্ব ন্যাস্ত হয় বাইতুল মালের উপর। এভাবেই ইসলাম সব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব পালন করে।

৯.১৫.২ ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক মূল সমস্যা

(المشكلة الاقتصادية فى نظرالاسلام)

এটা হচ্ছে সম্পদ ও সেবা সকল নাগরিকের মাঝে বন্টন করার বিষয়। অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে মূল সমস্যা সম্পদের উৎপাদন নয় বরং সমস্যা হচ্ছে সম্পদের বন্টন।

৯.১৫.৩ মালিকানার উৎস (اصل ملكية المال)

মৌলিকভাবে সম্পদের প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। তিনিই মানুষকে এই সম্পদ দান করেছেন এবং এভাবেই মানুষ এক ধরনের সত্ত্বাধিকার লাভ করেছে। আল্লাহ্ নিজেই ব্যক্তিকে সম্পদের উপর অধিকার লাভের অনুমতি দিয়েছেন। এটা একটা বিশেষ অনুমতি। এই বিশেষ অনুমোদনের কারনেই কার্যত মানুষকে সম্পদের মালিক বলে ধরে নেয়া হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

"তোমরা ঐ সম্পদ থেকে তাদেরকে দান কর, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন।"
[নূর, ৩৩]

এখানে সম্পদকে আল্লাহ্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

"এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর।"
[হাদীদ, ৭]

এ আয়াতে আল্লাহ্ মানুষকে সম্পদের উত্তরাধিকার দান করেছেন এবং তা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

৯.১৫.৪ মালিকানার প্রকার (انواع الملكية)

মালিকানা তিন প্রকার। যথা ১- ব্যক্তি মালিকানা, ২- গণ মালিকানা এবং ৩- রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

১. ব্যক্তি মালিকানা

শরীআতের পক্ষ থেকে মানুষকে মূল সম্পদ, সম্পদ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা (মানফা'আত) কিংবা এর বিনিময়কে খরচ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইসলাম সম্পদের ব্যক্তিমালিকানাকে মানুষের জন্য শরঈ অধিকার হিসাবে নির্ধারন করেছে। ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ অস্থাবর সম্পত্তি- যেমন পশু, নগদ অর্থ, যান বাহন, কাপড় ইত্যাদি এবং স্থাবর সম্পত্তি-যেমন জমীন, ঘর-বাড়ী, কারখানা ইত্যাদি সব কিছুর মালিক হতে পারে। শরীআত ব্যক্তিকে নিজের মালিকানা হস্তান্তর করার অধিকারও দিয়েছে। তবে শরীআত ঐসব উপায়গুলোও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যে উপায়ে ব্যক্তি সম্পদের মালিকানা লাভ করতে পারে এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে মালের প্রবৃদ্ধি সাধন করতে পারে। এমনি ভাবে সম্পদ খরচ করার ব্যাপারেও শরীআত নির্দিষ্ট কিছু উপায় ঠিক করে দিয়েছে।

মালিকানা লাভের উপায় সমূহ

শরীআত প্রনেতা (شـــارع) ঐসমস্ত উপায়-উপকরণ নির্ধারন করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে মানুষ সম্পদের মালিকানা লাভ কিংবা সম্পদ বিনিয়োগ করতে পারে। শরীআত বিভিন্ন ধরনের পরিশ্রমকে যেমন-নিজের কাজ নিজে কিংবা অন্যের কাজ নিজে করা বা কাউকে দিয়ে করিয়ে দেওয়াকে সম্পদের মালিকানা লাভের একটি উপায় হিসাবে নির্ধারন করেছে। অনাবাদী জমিন আবাদ করা, শিকার করা, ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ উত্তোলন, দালালী, ইত্যাদির মাধ্যমেও সম্পদের মালিক হওয়া যায়। এমনি ভাবে মুযারাবা (এক ধরনের অংশীদারী কারবার) ও মুসাকাতকেও (সেচ) মালিকানা হাসিলের উপায় হিসাবে নির্ধারন করা হয়েছে। অধিকন্তু মীরাস, জীবন রক্ষাকারী সাহায্য গ্রহন, সরকারী অনুদান, এমন সম্পদ, যা বিনা পরিশ্রম বা বিনা বিনিময়ে লাভ হয়- যেমন হেবা, অসিয়ত, দিয়্যত, মোহর ইত্যাদিকেও মালিকানার উপায় সাব্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি কাজ, ব্যবসা ও শিল্পকেও সম্পদ উপার্জন ও বিনিয়োগের উপায় হিসাবে ধার্য্য করা হয়েছে। শরীআত যেমনিভাবে সম্পদ উপার্জন ও বিনিয়োগের পন্থাসমূহ নির্ধারন করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সেসব পন্থাও চিহ্নিত করে দিয়েছে, যেগুলোকে একজন মুসলমান কখনও সম্পদ উপার্জন বা বিনিয়োগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে পারেনা। নিম্ন বর্ণিত উপায়ে সম্পদ উপার্জন ও বিনিয়োগ করা নিষিদ্ধ।

পুঁজিবাদী অংশিদারিত্ব কম্পানী (শেয়ার হোল্ডার কোম্পানী)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কর্তৃক উদ্ভাবিত শেয়ার হোল্ডার কোম্পানী করার অনুমোদন ইসলাম দেয়না। বরং এটা হারাম। কারন চুক্তি ও বেচা-কেনা শুদ্ধ হওয়ার যেসব শর্ত শরীআত উল্লেখ করেছে, তা উপরোক্ত ক্ষেত্রে পাওয়া যায়না। এসব কোম্পানীর শেয়ারে চুক্তির রোকন তথা ইজাব-কবুলও পাওয়া যায়না, এটা এক পক্ষ থেকে এক তরফা ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারন কেউ যদি কোম্পানীর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শর্ত পুরা করে, তাহলেই সে শরীক বলে গণ্য হয়। এমনি ভাবে, যে শুধু মাত্র একটি শেয়ার খরীদ করে সেও কোম্পানীর অংশীদার বনে যায়। এখানে প্রকৃত কোন দুই পক্ষ থাকেনা। বরং একতরফাভাবে এক পক্ষ কোম্পানী পরিচালনা করে। এই পদ্ধতিতে ইজাব কবুলের বিষয়টিও পাওয়া যায়না। বরং শুধু ইজাব পাওয়া যায়। এতে সম্পদ এবং ব্যক্তি একত্র হয়না। বরং শুধু সম্পদের অস্তিত্বই দৃশ্যমান হয়।

শরীআতের পক্ষ থেকে কোম্পানীর জন্য এই শর্ত আরোপ করা আছে যে, আকেদাইন অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পক্ষ থেকে ইজাব ও কবুল পাওয়া যেতে হবে। যেমন ব্যবসা, ভাড়া ইত্যাদি আরো যত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আছে। তাছাড়া অংশিদারিত্ব হতে পারে

দুই ব্যক্তি কিংবা এক ব্যক্তির শ্রম ও অন্য ব্যক্তির সম্পদের মধ্যে। কিন্তু ব্যক্তি ছাড়া শুধু সম্পত্তির মাঝে অংশিদারিত্ব জায়েয নেই। পুঁজিবাদী অংশিদারিত্ব কোম্পানী ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিকভাবে গঠিত নয় কেননা এ ক্ষেত্রে চুক্তির মৌলিক শর্তগুলোই পূরণ হয়না। এধরনের শেয়ার কোম্পানী যেহেতু বাতিল চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই এটা হারাম। অর্থাৎ শরীআত বর্ণিত নীতি মোতাবেক না হওয়ায় এধরনের ব্যবসায়িক চুক্তি আল্লাহ্‌র নিষেধের মধ্যে গণ্য। উপরন্ত যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা চুক্তির শর্ত পুরা করতে নির্দেশ দিয়েছেন আর তা পুরা না করার দরুন এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতাও পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"সুতরাং যারা তাঁর (মুহাম্মদ) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।"
[নুর, ৬৩]

এমনি ভাবে ইসলামে সুদ, ঘুষ, মজুতদারী, জুয়া, একচেটিয়াত্ব, ধোঁকাবাজী, প্রতারনা, বিশ্বাস ঘাতকতা, মদের ক্রয়-বিক্রয়, শুকরের ব্যবসা, মৃত পশু-পাখির গোস্ত বিক্রি, ক্রুশ বিক্রি, ক্রিসমাস ট্রি (জন্মোৎসব বৃক্ষ) বিক্রি, মূর্তি বিক্রি, চুরি, ছিনতাই, লুটতরাজ, ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করাও নিষেধ করা হয়েছে।

২. গণ মালিকানা

মালিকানার দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে গণ মালিকানা। গণ মালিকানা হয় ঐসব সম্পদের যেগুলোকে ইসলামিক শরীআ'হ সমস্ত মুসলমানের মালিকানায় দিয়ে দিয়েছে এবং একে মুসলমানদের যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি বলে স্থির করেছে। শরীআতে এগুলো ব্যবহার করা ব্যক্তির জন্য বৈধ করা হয়েছে ঠিক, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে। মৌলিক ভাবে এই সম্পত্তি মোট তিন ধরনের।

ক. সমাজের মানুষের বেঁচে থাকার নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরন, যা ছাড়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং যেগুলোর অভাবে মানুষ তার এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয় যেমন- পানি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

اَلنَّاسُ شُرَكَاءٌ فِيْ ثَلاَثٍ اَلْمَاءُ وَالْكِلاَءُ وَالنَّارُ

"তিন জিনিষের মাঝে সকল মানুষ শরীক। এগুলো হচ্ছে পানি, ঘাস (চারণ ভূমি) এবং আগুন।"

এই হাদীসের আবেদন উক্ত তিন বস্তুর মাঝেই সীমিত নয়, বরং এর আওতায় প্রত্যেক ঐ সমস্ত বস্তুও শামিল, যা সমাজের সকল মানুষের সমান ভাবে প্রয়োজন। একারনে ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং উপকরনও এর মধ্যে শামীল, যা মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনে ব্যবহার হয়। যেমন–পানি উত্তোলনের পাম্প, পানি সরবরাহের পাইপ লাইন, পানি-বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লান্ট, বিদ্যুতের খুটি, সরবরাহ তার ইত্যাদি।

খ. এমন সম্পত্তি যা তার স্বাভাবিক সৃষ্টিগত কারনেই ব্যক্তি মালিকানার কবজায় যাওয়ার উপযুক্ত নয়। যেমন নদী, বড় ময়দান, মসজিদ, মহা সড়ক ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) বলেন, مِنًّى مُنَاخٌ مَـــنْ سَـــبَقَ – **"যে আগে আসে, আমার দিক থেকে পরিবেশ তার অনুকুলে"** (অর্থাৎ আগে আসলে আগে পাবে)। এছাড়া আরো জিনিস আছে, যেমন- রেলগাড়ী, বিদ্যুতের খুটি, পানির পাইপ, মহা সড়কের সাথে সংযুক্ত পয়:প্রনালী ইত্যাদিও গণ মালিকানার মধ্যে গন্য। কারন এগুলো জন সাধারনের পথের সাথে সংযুক্ত। আর এমন পথ গণ মালিকানারই অন্তর্ভুক্ত। কোন মানুষ এসব জিনিসকে নিজের মালিকানায় নিয়ে নিতে পারেনা এবং এর থেকে উপকৃত হতে জন সাধারণকে বাধা দিতে পারেনা। রাসূলল্লাহ (সাঃ) বলেন, لاَحِمَى الاَّ لِلهِ وَرَسُـــوْلِه –**"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ছাড়া চারণ ভুমি আর কারো নয়"**। অতএব, এক মাত্র সরকার ছাড়া আর কেউ এগুলো থেকে মানুষকে বারণ করার অধিকার রাখেনা।

গ. এমন খনি, যাতে বিপুল পরিমান সম্পদ মজুদ আছে। এধরনের অনেক খনি আছে, যা বিভিন্ন রকম মুল্যবান খনিজ সম্পদে ভরপুর। এগুলো সকল মুসলমানের মালিকানাধীন সম্পত্তি। কোন কোম্পানী কিংবা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে এগুলোর মালিকানা দাবি করা জায়েয নেই। একারনে এগুলো থেকে সম্পদ উত্তোলন করা, মজুদ করে রাখা এবং বন্টন করার জন্য কোন কোম্পানী কিংবা ব্যক্তি বিশেষকে এর মালিকানা দিয়ে দেওয়া বৈধ নয়। বরং এগুলোকে সমস্ত মুসলমানদের মালিকানায় রাখা জরুরী। এতে সকল মুসলমান শরীক। রাষ্ট্র নিজে এসব সম্পত্তি উত্তোলন করবে কিংবা কাউকে ঠিকাদার নিয়োগ করবে অথবা সকল মুসলমানের প্রতিনিধি হওয়ার ভিত্তিতে এসব খনিজ দ্রব্য বিক্রি করে এর রাজস্ব বাইতুল মালে গচ্ছিত রাখবে। এসমস্ত খনি ভূগর্ভস্থ হউক বা ভূপৃষ্টে হউক তাতে হুকুমের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য হবেনা। ভূপৃষ্টের খনি যেমন–লবন, সুরমা ইত্যাদির খনি। ভূগর্ভস্থ খনি (যার সম্পদ উত্তোলন করা খুবই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার) যেমন– সোনা, রূপা, পিতল, তামা, ইউরেনিয়াম, পেট্রোল ইত্যাদির খনি। এর দলীল হচ্ছে ইবনে হাম্মাল আল মাযূনী (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস,

اَنَّهُ اِسْتَقْطَعَ رَسُوْلَ اللهِ الْمِلْحَ بِمَآرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا وَلّى قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَتَدْرِى مَا قطَعْتَ لَهُ؟ اِنَّمَا اَقْطَعْتَه الْمآءَ الْعِد قَالَ فَرْجِعْهُ مِنْهُ

"ইবনে হাম্মাল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট মারিব নামক স্থানের কিছু সম্পত্তি অনুদান হিসাবে তাকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রাসূল (সাঃ) তা তাকে দিয়ে দিলেন। যখন তিনি চলে গেলেন তখন লোকেরা বলল- ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কি জানেন আপনি তাকে কি দিয়েছেন? আপনি তাকে অফুরন্ত পানির উৎস দিয়ে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন- এরপর রাসূল (সাঃ) এটা ফেরত নিয়ে নিলেন।"

ছোট এবং পরিমানে সীমিত খনি গুলোর হুকুম অবশ্য ভিন্ন। কোন ব্যক্তি বিশেষও এ ধরনের খনির মালিক হতে পারে। যেমন আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) হযরত বিলাল বিন হারিস আলমাযূনীকে (রাঃ) হিজাজে-"মাআদিনুল কবিলা" নামক খনিটির মালিক বানিয়ে দিয়েছিলেন।

গণ মালিকানাধীন সম্পত্তি ব্যবহারের উপায়

যেহেতু গণ মালিকানাধীন সম্পত্তিতে যৌথ ভাবে সকল নাগরিকের মালিকানা রয়েছে, সেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিই এই সম্পদ ব্যবহার করতে পারে। যদি এর ধরন এমন হয় যে, প্রত্যেকে সরাসরি এটা ব্যবহার করতে পারে - যেমন- পানি, ঘাস, আগুন, জনপথ ইত্যাদি; তাহলে ব্যক্তিগত ভাবে তারা এগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। আর যদি এমনটা সম্ভব না হয়, যেমন পেট্রোল বা অন্যান্য প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পত্তির ক্ষেত্রে, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র এগুলো উত্তোলনের ব্যবস্থা করবে, এগুলো থেকে উপার্জিত অর্থ বাইতুল মালে জমা রাখবে। খলীফা প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের কল্যানার্থে উপযুক্ত খাতে এগুলো ব্যয় করবেন। নিম্ন বর্নিত পদ্ধতিতে খলীফা তা বন্টনও করে দিতে পারেন।

ক. খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত বিভাগে এগুলোর অর্থ ব্যয় করা অর্থাৎ এ বিভাগের জন্য ভবন নির্মান, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, বিশেষজ্ঞ, যন্ত্র পাতি এবং কারখানা ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা যাবে।

খ. এই সম্পত্তির মালিক অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য তা সরাসরি ব্যয় করা যাবে অর্থাৎ খলীফা সরাসরি এগুলো মানুষের মাঝে বিতরন করে দিতে পারবেন। যেমন পেট্রোল, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিনা মূল্যে সরবরাহ করবেন কিংবা এর আয় থেকে উপার্জিত অর্থ মুসলমানদের কল্যাণ মূলক খাতে ব্যয় করবেন।

গ. যখন বাইতুল মালে পর্যাপ্ত অর্থ থাকবেনা তখন জিহাদ কিংবা এর জন্য অস্ত্র ও সৈন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এধরনের সম্পদ ব্যয় করা হবে। প্রনিধান যোগ্য যে, বাইতুল মালে কোন সম্পত্তি না থাকলেও জিহাদের জন্য খরচ করা মুসলমানদের জন্য ফরয।

৩. রাষ্ট্রীয় মালিকানা

মালিকানার তৃতীয় প্রকার হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানা। এর মাঝে এমন প্রত্যেক সম্পদ শামীল, যা ভূমি বা ইমারাত হওয়ার দিক থেকে যদিও সাধারন জনগনের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু গণমালিকনার অন্তর্ভূক্ত নয়। এ ধরনের সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানারও উপযুক্ত। যেমন ভূমি, অট্টালিকা, স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু এগুলো সাধারন জনগনের ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু এগুলোর রক্ষনাবেক্ষন ও নিয়ন্ত্রন করার দায়িত্ব খলীফার উপর ন্যাস্ত। কেননা জনগনের অধিকার সংরক্ষনের স্বার্থে যেকোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কেবলমাত্র খলীফারই রয়েছে। মরুভূমি, পাহাড়, বন্দর এলাকা, বিশেষ কোন ব্যক্তির মালিকনাধীন নয়– এমন অনাবাদী জমিন, অট্টালিকা এবং পানি পানের স্থান (কুপ ইত্যাদি), এমন সম্পত্তি-যা রাষ্ট্র কর্তৃক খরীদ করা, কিংবা রাষ্ট্র যা নির্মান করেছে, অথবা যুদ্ধ করে শত্রু থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, বিভিন্ন অফিসের জন্য ব্যবহৃত বাড়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পদ।

খলীফা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে ব্যক্তির মালিকানায়ও দিতে পারে। যেমন ভূমি, বাড়ী ইত্যাদি। এটা মুনাফার ব্যাপারেও হতে পারে আবার মূল সম্পত্তির বেলায়ও হতে পারে। অথবা খলীফা তাদেরকে এমন অনুমতি দিতে পারে যে, ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমীন আবাদ করে তার মালিক হয়ে যাবে। মোট কথা যেভাবেই এটা ব্যবহার করা হোকনা কেন তা অবশ্যই মুসলমানদের উপকারার্থে হতে হবে।

৯.১৫.৫ ভূমি সমূহ (الاراضى)

ভূমির ক্ষেত্রে একটি বিষয় হচ্ছে ভূমির মূল **(رقبة)** এর মালিকানা। আরেকটি বিষয় হচেছ ভূমির মুনাফা বা রাকাবাহ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা **(منفعـــة)**। ইসলাম উভয়কে মানুষের জন্য মুবাহ (বৈধ) করেছে। তবে উভয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধানও রেখেছে।

ভূমির প্রকার সমূহঃ-

ভূমি দুই প্রকার উশরী ও খেরাজী ।

ক. উশরী জমিন বলা হয় এমন ভূমিকে, যেখানকার বাসিন্দারা নিজে থেকেই মুসলমান হয়েছে। যেমন হিজাজ ও ইন্দোনিশিয়ার মুসলমান। এমন অনাবাদী জমিনকেও উশরী জমিন বলা হয়, যা মানুষ নিজে আবাদ করে।

উশরী জমীনের ক্ষেত্রে খোদ ভূমি বা তার আয় উভয়েরই মালিক হওয়া যায়। উশরী জমিনের উৎপাদিত ফসলের উপর যাকাত দিতে হয়। যে ভূমি সেচের জন্য বৃষ্টি কিংবা জোয়ারের পানি ছাড়া অন্য উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না, সেভূমির ফসলের দশ

ভাগের এক ভাগ যাকাত (উশর) হিসাবে প্রদান করতে হয়। যদি তা সেচ করার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়, তাহলে উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ (নিসফে উশর) যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হয়।

খ. খেরাজী জমিন হচ্ছে হিজাজ ব্যতীত এমন ভূমি, যা জিহাদ কিংবা সন্ধির মাধ্যমে হস্তগত হয়েছে। যেমন ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের ভূমি। এমন জমিনের ক্ষেত্রে রাকাবা তথা মূল ভূমি সমস্ত মুসলমানের মালিকানাধীন থাকে, তবে রাষ্ট্র থাকে এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের নায়েব বা প্রতিনিধি। ব্যক্তি শুধু এর মুনাফার মালিক হতে পারে। খেরাজি জমিনের ক্ষেত্রে খেরাজ আদায় করতে হয়। এর পরিমান সেটাই হবে, যেটা রাষ্ট্র নির্ধারন করবে। খেরাজ আলাদা করার পর যদি এ জমিনের উৎপন্ন ফসল নেসাব পরিমান হয়, তাহলে তা থেকে যাকাত আদায় করতে হবে।

মোট কথা ব্যক্তি উশরী জমিন থেকে লাভবান হতে পারে এই অর্থে যে, সে তা বিক্রি করতে পারে, মিরাছ বা হেবা হিসাবে প্রদান বা গ্রহন করতে পারে। এ হুকুম খেরাজী জমির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৯.১৫.৬ শিল্প কারখানা (المصانع)

শিল্প কারখানাও ব্যক্তি মালিকানায় থাকা জায়েয আছে। যেমন গাড়ীর কারখানা, ফার্নিচার, গার্মেন্টস সামগ্রী ইত্যাদির কারখানা। এমনি ভাবে রাষ্ট্রের মালিকানায়ও বিভিন্ন কল-কারখানা থাকতে পারে। যেমন-অস্ত্র কারখানা, তেল উত্তোলন ও শোধনাগার, বিভিন্ন খনিজ সম্পদ উত্তোলন কেন্দ্র ইত্যাদি। এ ছাড়া গণমালিকানায়ও কল কারখানা থাকতে পারে। যেমন লোহা, ইস্পাত, স্বর্ন-রৌপ্য,পেট্রোল ইত্যাদি খনিজ সম্পদের ফ্যাক্টরী।

এধরনের কল কারখানার মালিকানা এগুলো থেকে উৎপাদিত পন্যের মালিকানার অনুরূপ হবে। কারণ মূলনীতি হলো ان المصنع يأخذ حكم ما ينتج অর্থাৎ " উৎপাদিত পন্যের হুকুমই কারখানার হুকুম"।

৯.১৫.৭ বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)

বাইতুল মালের আয়ের উৎস সমূহ

১- আনফাল, গনিমত, মালে ফায় এবং খুমুছ

২– খেরাজ

৩- জিযিয়া

৪- গণ মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে উপার্জিত বিভিন্ন প্রকার আয়;এগুলো রাখা হয় বিশেষ বিভাগে

৫– রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পদ থেকে অর্জিত রাজস্ব

৬– বিভিন্ন সীমান্তে সংগৃহীত শুল্ক

৭– গুপ্তধন এবং ছোট খনির এক পঞ্চমাংশ(খুমুছ)

৮- বিভিন্ন প্রকার কর (ضرائب)

৯- যাকাত বাবত আদায়কৃত সম্পদ। এটিও বিশেষ বিভাগে রাখা হয়

৯.১৫.৮ নগদ অর্থের ব্যাপারে স্বর্ন- রৌপ্যকে মূল ভিত্তি বানানোর-বাধ্যবাধকতা

(وجوب ان يكون النقد ذهبا وفضة)

রাসূল (সাঃ) এর যুগে মানুষ স্বর্ন ও রৌপ্যকেই তাদের লেন-দেনের জন্য বিনিময় মূদ্রা বা নগদ অর্থের মানদন্ড হিসাবে মনে করতো এবং পাশাপাশি উভয়টিই ব্যবহার করতো। এছাড়া প্রাথমিক যুগে পার্সী ও রোমান দেরহাম দীনারই নগদ অর্থ হিসাবে আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাসূল (সাঃ) এর যুগ থেকে খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেরা কোন মুদ্রা তৈরী করেনি। খলীফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ান তার যুগে এক ধরনের বিশেষ আকৃতির মুদ্রা বানিয়ে ছিলেন, যা ছিল ইসলামী কারুকার্য দ্বারা সুশোভিত। আর তার ভিত্তিও রাখা হয়েছিল স্বর্ন রূপার মানদন্ডের উপর। অর্থাৎ শরঈ দীনার ও দেরহামের মাপের উপর।

ইসলাম স্বর্ন-রৌপ্যের সাথে অনেক বিধি-বিধানকে সংশ্লিষ্ট করে রেখেছে। যেমন এগুলো সোনা-রূপা হওয়ার দিক থেকে অর্থাৎ ব্যবহার্য্য মূল্যবান ধাতু হিসাবে, নগদ অর্থ ও মুদ্রা হওয়ার দিক থেকে, পণ্য সামগ্রীর মুল্য হওয়ার দিক থেকে এবং শ্রমের বিনিময় হওয়ার দিক থেকে। শরীআত সোনা-রূপার মুদ্রা মজুত করে রাখাকে হারাম করে দিয়েছে। এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট এমন মাসআলাও আছে, যা সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। ইসলাম সোনা ও রূপা এই দুই প্রকার মুদ্রা হওয়ার কথা বলেছে। এগুলোর উপর যাকাত ফরয হয়েছে এবং এসব মুদ্রাকে পন্য সামগ্রীর মূল্য হিসাবে বিবেচনা করেছে। সোনার দীনার আর রূপার দিরহামের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিষয়ের (যেমন যাকাত) নেসাব নির্ণয় করা হয়েছে। যদি দিয়্যাত (রক্ত পন) ওয়াজিব হয়, তখনও এই মুদ্রার হিসাবে তা পরিশোধ করার কথা বলা হয়েছে। এর জন্য সোনা রূপার একটি নির্দিষ্ট পরিমান নির্ধারন করা হয়েছে। যার বিবরণ হচ্ছে এই যে, স্বর্নের ক্ষেত্রে একহাজার দীনার। আর রূপার ক্ষেত্রে ১২ হাজার দিরহাম। যখন চুরি করলে হাত কাটা ফরয করা হয়েছে, তখন এর জন্য একটি ন্যুনতম সীমাও নির্ধারন করা হয়েছে। অর্থাৎ কি পরিমান সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা যাবে, সেটিও নির্ধারিত হয়েছে সোনা রূপার পরিমাণের ভিত্তিতে।

দুই প্রকার মুদ্রা, বিনিময় মাধ্যম, জিনিষপত্রের মূল্য ইত্যাদি হিসাবে সোনা-রূপার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছে। এটা খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, শুধু সোনা-রূপাই হবে নগদ অর্থ নির্ণয়ের মাপ কাঠি। যার মাধ্যমে জিনিস পত্রের দাম নির্ধারন করা হবে এবং শ্রমের বিনিময় দেওয়া হবে।

এটাই হচ্ছে এ কথার বড় দলীল যে ইসলাম সোনা রূপাকেই নগদ অর্থের মান দন্ড নির্ণয় করেছে। কারণ নগদ অর্থের সাথে সম্পর্কিত যত হুকুম আহকাম আছে, সবই সোনা রূপার মানে আবদ্ধ।

এই ভিত্তির উপর নির্ভর করেই মুসলমানদের নগদ লেনদেনের মাপকাঠি সোনা-রূপা হওয়াই অপরিহার্য্য। খলীফারও করনীয় হলো সোনা-রূপাকেই নগদ অর্থের ভিত্তি নির্ধারণ করা, আর সোনা-রূপার ঐ নিয়মের উপর চলা, যা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রচলিত ছিল। খিলাফত ভিত্তিক সরকারের আরো দায়িত্ব হলো একটি নির্দিষ্ট ও বিশেষ রূপের মুদ্রা চালু করা, দীনারের পরিমাপ শরঈ দীনারের মাপে নির্ধারণ করা অর্থাৎ এক দীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম। এটা হচ্ছে মিছকালের (مثقـــال) ওজন। রূপার দেরহামের ওজনও হবে শরঈ দেরহাম বরাবর। যাকে وزن بيـــع ও বলা হয়। অর্থাৎ প্রতি দশ দেরহামের ওজন হবে সাত মিছকাল বরাবর। দেরহামের মুদ্রা হবে– ২.৯৭৫ গ্রাম বরাবর। সোনা–রূপার মুদ্রার প্রচলনকে ফিরিয়ে আনাই মুদ্রা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধানের একমাত্র উপায়। এছাড়া বিশ্বব্যাপী বিরাজমান তীব্র মূল্য স্ফীতি নিয়ন্ত্রনের উপায়ও এটিই। মুদ্রা বিনিময় হারের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধন করাও এর মাধ্যমে সম্ভব হবে । এই সোনা–রূপার নীতি অবলম্বন করেই আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের উপর মার্কিন প্রাধান্য এবং বিশ্ব অর্থনীতির উপর ডলারের প্রভাব ও কর্তৃত্ব খর্ব করে দেয়া সম্ভব।

৯.১৬ শিক্ষা নীতি (سياسة التعليم)

শিক্ষা সিলেবাসের ভিত্তি হওয়া উচিৎ ইসলামী আকীদার উপর। তাই পাঠ দান পদ্ধতি, শিক্ষা কারিকুলাম ইত্যাদি সব কিছুই বর্তমানে প্রচলিত নিয়মের চেয়ে ভিন্ন হবে। অর্থাৎ শিক্ষা নীতির উদ্দেশ্য হবে মানুষের চরিত্র ও চিন্তা চেতনার (عقلية و نفسية) উৎকর্ষ সাধন। এ কারনে শিক্ষার যাবতীয় বিষয়াদিকে ইসলামী আকীদার বুনিয়াদের উপরই স্থাপন করা উচিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য যেহেতু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো, জীবনের যাবতীয় ব্যপারে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং সর্বোপরি ইসলামী ব্যক্তিত্ব গঠন করা, সেহেতু শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির শিক্ষা থাকা অপরিহার্য।

৯.১৭ রাজনীতি ও বৈদেশিক নীতি বিষয়ক চিন্তা

(افكار فىالعلاقات العامة والسياسة الخارجية)

রাজনীতি হচ্ছে উম্মাহ ও রাষ্ট্রের ভিতর ও বাহিরের বিষয়াদির দেখা শোনা এবং তত্ত্বাবধান করা। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ দায়িত্বটি পালনের উপায় হচ্ছে–মানুষের উপর একটা ব্যবস্থা কার্যকর করা, আভ্যন্তরীনভাবে জনগণের প্রয়োজনাদির প্রতি খেয়াল রাখা ও তাদের স্বার্থ

সংরক্ষণ করা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করা, পরাশক্তি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা এবং দাওয়াত ও জিহাদের পথ অনুসরণ করে অন্যান্য জাতির কাছে ইসলামের বাণী তুলে ধরার নীতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। অপর দিকে উম্মাহ্ এবং তার মধ্যস্থিত রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালনের উপায় হচ্ছে- উম্মাহ্'র সর্ব বিষয়ে তত্ত্বাবধান সম্পর্কে শাসকদের কার্যক্রমের খোজ-খবর রাখা, তাদের কর্ম-কান্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং মুসলমানদের লেন-দেন ও বিষয়াদীর রক্ষনাবেক্ষণ সম্পর্কে সরকারকে সঠিক পরামর্শ দেয়া।

৯.১৮ দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর (دارالاسلام ودارالكفر)

দারুল ইসলাম বলা হয় এমন ভূখন্ডকে, যেখানে জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের হুকুম আহকাম কার্যকর থাকে আর ঐ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করেন ইসলামী কর্তৃপক্ষ; এমনকি সেখানের অধিকাংশ-বাসিন্দা যদি অমুসলিম হয় তবুও।

দারুল কুফর বলা হয় এমন ভূখন্ডকে, যেখানে জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদীতে কুফুরী বিধি-বিধান কার্যকর থাকে এবং এর নিরাপত্তা হয় কুফুরী নিরাপত্তার অধীন এমনকি এর সব বাসিন্দা মুসলিম হলেও। সুতরাং দারুল ইসলাম বা দারুল কুফর নির্ণয় হয় সেখানে কার্যকর বিধি-বিধান ও নিরাপত্তার বিবেচনায়, বসবাসকারী জনগনের ধর্মীয় পরিচয়ের বিবেচনায় নয়। বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর একটিও এমন নেই, যেখানে সরকার ও জীবনের প্রতিটি বিষয়াদীতে ইসলামের হুকুম-আহ্কাম কার্যকর আছে। এই বিবেচনায় আজকের প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রই দারুল কুফুরের হুকুমে, যদিও এগুলোর অধিকাংশ বাসিন্দাই মুসলিম।

ইসলাম প্রতিটি মুসলমানের জন্য একাজ ফরয করে দিয়েছে যে, তারা যেন এই দেশগুলোকে দারুল কুফুর থেকে পরিবর্তন করে দারুল ইসলামে পরিণত করে। আর এটা করার বাস্তবতা হচ্ছে একটি ইসলামী রাষ্ট্র তথা খিলাফত কায়েম করা। খিলাফত ব্যবস্থায় মুসলমানগন একজন খলীফা নিযুক্ত করে তার হাতে এই শর্তে বাইআত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহন করে যে, তিনি রাষ্ট্রে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধি-বিধান তথা ইসলামী হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করবেন। এটাও মুসলমানদের দায়িত্ব যে, কোথাও খিলাফত কায়েম হয়ে গেলে তার সাথে মিলে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এক খিলাফতের অধীনে আনার জন্য কাজ করা। এভাবেই বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলামে পরিণত হবে এবং এখান থেকে মুসলমানগন ইসলামের পতাকাবাহী রূপে দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে ইসলামকে সমগ্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবে।

৯.১৯ জিহাদ (الجهاد)

জিহাদ বলা হয় আল্লাহ্‌র কালিমাকে (বাণী) সবকিছুর উপরে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করাকে। তেমনিভাবে সরাসরি দাওয়াত দেওয়া কিংবা দাওয়াতের কাজে ধন সম্পদ দিয়ে, মতামত ও রায় দিয়ে, ব্যাপক জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করে অথবা অন্য কোন ভাবে মদদ করাও জিহাদের মধ্যে শামীল। মোট কথা আল্লাহ্‌র বাণীকে উচ্চ করা এবং ইসলামকে সম্প্রসারনের জন্য লড়াই করার নাম হচ্ছে জিহাদ। আর এটা একটি ফরয যার দলীল হচ্ছে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত ও রাসূল (সাঃ) এর বহু সুস্পষ্ট হাদীস।

প্রাথমিকভাবে জিহাদ করা মুসলমানদের জন্য ফরযে কিফায়া। কিন্তু দুশমনের পক্ষ থেকে আক্রমন করা হলে তা ফরযে আইন হয়ে যায়। প্রাথমিক ভাবে ফরযে কেফায়া হওয়ার অর্থ হলো যদি দুশমন আক্রমন নাও করে, তবু আমরা জিহাদ শুরু করব। সুতরাং যদি কোন যুগে কেউ কোথাও জিহাদ না করে, তাহলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌ গুনাহগার হবে। কারন জিহাদ শুধু মাত্র আত্মরক্ষা মূলক বিষয় নয়, বরং এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণীকে বুলন্দ করার লড়াই। যদি শত্রুর পক্ষ থেকে আক্রমন নাও হয় তারপরও ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামকে সম্প্রসারনের স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী খিলাফতের পক্ষ থেকে জিহাদের সূচনা করা ফরয।

৯.২০ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (العلاقات الدولية)

ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে বহির্বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপিত হবে ইসলামের নিয়ম-নীতি মোতাবেক । এসব সম্পর্কের ধরন হবে নিম্নরূপ।

১– বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে একটি মাত্র রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। কেননা মুসলমানগণ এক উম্মাহ্‌। এটা তাদের জন্য অপরিহার্য যে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং একই রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে। তাই এদের পারস্পরিক সম্পর্ক পররাষ্ট্র নীতি ভিত্তিক হবেনা বরং তা হবে আভ্যন্তরীন নীতি ভিত্তিক। এক মুসলিম দেশের সাথে অপর মুসলিম দেশের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন কুটনৈতিক সম্পর্ক বা চুক্তি থাকবেনা বরং তখন সবগুলোকে একই খিলাফতে আনার জন্য কাজ করা মুসলমানদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। যখন এ রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলামে পরিনত হবে,তখন এগুলোর নাগরিকদের বিদেশী মনে করা হবেনা। বরং তারা খিলাফতের নাগরিক হিসাবেই বিবেচিত হবে।

২– এছাড়া পৃথিবীতে পূর্ব-পশ্চিমে যত রাষ্ট্র আছে, সবগুলোকে দারুল কুফর ধরা হবে। এগুলো দারুল কুফর বা ক্ষেত্র বিশেষে দারুল হরব হিসাবে বিবেচিত হবে। এদের সাথে সম্পর্ক হবে পররাষ্ট্রনীতি ভিত্তিক। এসব রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক হবে

জিহাদের চাহিদা মোতাবেক এবং শরীআতের নীতি, মুসলিম উম্মাহ্ ও খিলাফত রাষ্ট্রের স্বার্থ অনুযায়ী।

৩– কুফরী রাষ্ট্রের সাথে ভাল প্রতিবেশী হওয়ার চুক্তি, ব্যবসা, অর্থনীতি, জ্ঞান বিজ্ঞান, কৃষি ইত্যাদি যে সব বিষয়ে ইসলাম অনুমোদন দেয়, সে সব বিষয়ে সীমিত সময়ের জন্য চুক্তি করা যায়। তবে এসব চুক্তি করতে হবে জিহাদ, মুসলমান ও খিলাফত রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকুলে। চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর সাথে চুক্তিতে বর্ণিত শর্তানুযায়ী আচরণ করা হবে। এসব রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসা ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সীমিত সময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ও সুনির্ধারিত শর্তে চুক্তি করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এর দ্বারা মুসলমানদের প্রয়োজন পূর্ণ হয়। তবে ঐ সব রাষ্ট্রের অবস্থা মজবুত হওয়ার মত শর্তের ভিত্তিতে কোন চুক্তি করা যাবে না। যদি চুক্তিতে এরকম উল্লেখ থাকে যে, ঐসব রাষ্ট্রের নাগরিকগণ পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে পাসপোর্ট ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবে তাহলে সেরূপ অনুমতি তাদেরকে দেয়া যাবে। তবে এই চুক্তিতে এটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, অনুরূপ সুবিধা মুসলমানরাও সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে পাবে।

৪– যেসব রাষ্ট্রের সাথে খিলাফতের কোন চুক্তি থাকবেনা সেগুলো হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী/ উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসমূহ, যেমন- আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স; অথবা এমন রাষ্ট্র, যারা মুসলমানদের উপর নিয়ন্ত্রন লাভের আকাংখা পোষণ করে যেমন- রাশিয়া। এসব রাষ্ট্র খিলাফতের দৃষ্টিতে দারুল হরব রূপে বিবেচিত হবে। এদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ সতর্কতা বজায় রাখা হবে। এদের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্কও থাকবেনা। খিলাফত রাষ্ট্রেও এদের কোন দুতাবাস খোলার অনুমতি থাকবেনা। এসব রাষ্ট্রের নাগরিকরা পাসপোর্টসহ খিলাফতের যাবতীয় অনুমোদন সাপেক্ষেই কেবল খিলাফত রাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবে এবং যতবার প্রবেশ করবে ততবারই নতুন করে অনুমতি নিতে হবে।

৫– এমন রাষ্ট্র যে গুলো কার্যত: যুদ্ধে লিপ্ত, যেমন ইসরাইল; এগুলোর ক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ে যুদ্ধাবস্থার আচরণই করা হবে। চাই খিলাফতের সাথে এদের যুদ্ধ চলমান থাকুক বা না থাকুক। এদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে যুদ্ধের। এদের নাগরিকদের জন্য খিলাফত রাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। এসব অমুসলিমদের রক্ত ও সম্পদ আমাদের জন্য থাকবে বৈধ।

কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত দেশের সাথে সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করা যাবে। কিন্তু কোন স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তি করা যাবে না। কেননা এটা করা হলে জিহাদ বন্ধ হয়ে যায়। যদি কোন কুফুরী রাষ্ট্র মুসলমানদের কোন ভূমি দখল করে নেয়, যেমন ইসরাঈল দখল করে নিয়েছে ফিলিস্তিনের ভূমি; এদের সাথে কোন ধরনের শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুমতি শরীআহ দেয়না। এমনকি মুসলমানদের এক ইঞ্চি ভূমিও যদি তাদের দখলে থাকে তবুও নয়। কারণ আমাদের ভূমি দখলের মাধ্যমে এরা আগ্রাসী শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এমতাবস্থায় এদের সাথে শান্তি চুক্তি করার অর্থই হবে নিজেদের ভূমি থেকে হাত গুটিয়ে

নেওয়া এবং ঐ ভূমি ও সেখানে বসবাসরত মুসলমানদের উপর কাফেরদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়া। অথচ ইসলামী শরীআহ-এর দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ। ইসলাম এদের সাথে যুদ্ধ করাকে সমস্ত মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে । শুধু তাই নয়, এ ধরনের রাষ্ট্রকে পরাজিত করা এবং মুসলিম ভূমি থেকে বিতাড়ন করাও মুসলমানদের জন্য ফরয। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً

"এবং আল্লাহ্ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না।" [নিসা, ১৪১]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

فَمَنِعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ

"সুতরাং যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও অনুরূপভাবে তাদের উপর আক্রমণ করবে।" [বাকারা, ১৯৪]

৬– খিলাফত রাষ্ট্রের জন্য অন্য কোন কুফুরী রাষ্ট্রের সাথে সামরিক জোট গঠন করা জায়েয নেই। যেমন যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি, দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তি এবং এর সাথে সম্পর্কিত সামরিক সহযোগীতা ইত্যাদি। এমনিভাবে কাফেরদেরকে সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেওয়া,বিমান বন্দর, নৌবন্দর ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া ইসলামী নীতিতে হারাম। কারণ মুসলমানদের জন্য কাফেরদের পতাকাতলে লড়াইকরা, কুফরী পথে লড়াই করা, কুফর রাষ্ট্র রক্ষার জন্য লড়াই করা এবং কাফেরদেরকে মুসলমান জনগণ বা ইসলামী ভূমির নিয়ন্ত্রন দান করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

৭– কাফের রাষ্ট্র কিংবা তাদের সেনাবাহিনীর কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদেরকে এমন করতে নিষেধ করেছেন।
যেমন তিনি বলেছেন,

لاَتَسْتَضِيْئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ

"তোমরা মুশরিকদের আগুন থেকে আলো গ্রহন করোনা।"

এখানে النار - অর্থাৎ আগুন বলে সামরিক শক্তি বুঝানো হয়েছে।

তিনি (সাঃ) আরো ইরশাদ করেছেন,

اِنَّا لاَ نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ

"আমরা কোন মুশরিকের কাছে সাহায্য চাইনা।"

এমনি ভাবে ঐসব দেশ থেকে ঋন ও সাহায্য নেওয়াও জায়েয নেই। কারণ ঋন ও সাহায্য দেওয়ার মাঝে তাদের স্বার্থ নিহীত থাকে এবং এর মাঝে সুদ থাকে। তাছাড়া এই ঋন ও সাহায্য মুসলমানদের উপর ঐসব রাষ্ট্রের প্রধান্য বিস্তারের উপায় হয়ে দাঁড়ায়। আর এটা নিম্ন বর্নিত মূলনীতির দরুন হারাম।

اَلْوَسِيْلَةُ اِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ

"যা হারামের উসিলা হয়ে থাকে, তাও হারাম"।

মুসলমানদের নিজেদের বিষয়ে সমাধান লাভের জন্যও কাফেরদের নিকট যাওয়া জায়েয নেই। যেমন নিজেদের কোন সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার জন্য আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন কিংবা ফ্রান্সের নিকট পেশ করা। কারণ এটা মুসলিম দেশের উপর প্রভাব খাটানো এবং তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপারে কাফেরদের সুযোগ করে দেয়। অথচ আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের উপর কাফেরদেরকে ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ করে দিতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করেছেন ।

এমনি ভাবে মুসলমানদের জন্য জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠন ব্যাংক ইত্যাদির মত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সদস্য হওয়াও জায়েয নেই। কারণ এই সংস্থাগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া এই সংস্থাগুলো অন্যান্য পরাশক্তি বিশেষত: আমেরিকার মত দেশগুলোর হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। এগুলোর মাধ্যমে তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে। অথচ, মুসলমানদের উপর কাফেরদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দেয়া কিংবা মুসলমানদের স্বার্থের বিপরীতে কাফেরদের স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ করে দেয়া শরী'আতে হারাম। অতএব, এসবে যোগ দেওয়াও হারাম। কারন হারামের উসিলাও হারাম।

অনুরূপভাবে মুসলমানদের জন্য আরব লীগ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা, যৌথ প্রতিরক্ষা সংস্থা ইত্যাদি আঞ্চলিক চুক্তি ও ফোরামে যোগ দেওয়াও হারাম। কারণ এগুলোও এমন বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্টিত, যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া এধরনের সংগঠন মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তিকে বজায় রাখে এবং এক খিলাফতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে অন্তরায় হিসাবে কাজ করে।